আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালার ষট্‌ত্রিংশ গ্রন্থ

পথে-বিপথে

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চৈত্র—১৩২৫

প্রকাশক:—
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

প্রিণ্টার — শ্রীবিহারীলাল নাথ,
এমারেল্ড প্রিণ্টিং ওয়ার্কস,
৯, নন্দকুমার চৌধুরীর ২য় লেন, কলিকাতা।

সূচী

পথে-বিপথে

মোহিনী

ফেরি-ষ্টীমারে অবিনের সঙ্গে অনেক বছরের পর দেখা হতেই সে আমাকে একেবারে একখানা ছবি দেখিয়ে বল্লে—"দেখতে পাচ্ছ?" তোমার-আমার মতো হলে প্রথম প্রশ্ন হতো—তুমি কে হে? বা তোমাকে তো চিন্‌লেম না! কিন্তু অবিন, সে কোনোদিনই আমাদের মতো সাধারণ-একটা-কিছু ছিল না; সুতরাং সে আমাকে না চিনলেও, সে যে অবিন, এটার প্রমাণ পেতে আমার একটুও দেরী হল না। ছবিটার সবটা দেখ্‌লেম অন্ধকার; কেবল নীচে একটা পিতলের ফলকে বড়-বড়-করে লেখা ছিল—"মোহিনী"। আমি সেইটে দেখিয়ে বল্লেম—"মোহিনী বুঝি?"

অবিন খানিকটা নিশ্বাস ফেলে বল্লে—"পেলে না। তবে শোনো!"—বলেই আমাকে টেনে মাঝের বেঞ্চে বসালে। তখন শীতের সকাল; কুয়াশা ঠেলে জাহাজখানা খুব আস্তে-আস্তে জল-কেটে চলেছে। অবিন সুরু করলে—

"কলকাতায় আমাদের বাসা-বাড়িখানা অনেক-দিনের। এখন সেটা আমাদের বসত-বাড়ি হয়েছে বটে, কিন্তু সেকালে কর্ত্তারা সে-বাসাটা কেবল গঙ্গাস্নান আর কালীঘাট করবার জন্তেই বানিয়েছিলেন। খুবই পুরোনো এই বাসাবাড়ির ঘরগুলো, ঝাড়লণ্ঠন কৌচ-কেদারা ওয়াটার-পেন্টিং অয়েল-পেন্টিং বড়-বড় আয়না এবং সোনার ঝালর-দেওয়া মখমলের ভারি-ভারি পর্দা দিয়ে যতদূর সম্ভব জাঁকালো এবং মানুষের প্রতিদিন বসবাসের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী করে কর্ত্তারা সাজিয়ে গিয়েছিলেন। আমাকে সেকালের সেই ধুলোয় ভরা, পুরোনো মদের ছোপ্‌ধরা, সাবেকী আতরের গন্ধমাখানো এই সব ফার্নিচার তখন কতক বিক্রি করে, কতক ঝেড়ে-ঝুড়ে মেরামত করে, আর কতক-বা একেবারে ফেলে দিয়ে বাড়িখানাকে একালের বসবাসের মতো করে নিতে হচ্ছিল। আমি এখনো যেমন, তখনো অবিবাহিত। সেই সময় একদিন এই ছবিটা আমার হাতে পড়ল। খানিকটা কালো-অন্ধকারের রং লেপা ;—কেবলমাত্র দুটি সুন্দর চোখ—তাও অনেকক্ষণ ধরে ছবিটার দিকে চেয়ে থাকলে তবে দেখা যেত।"

জাহাজ এসে কাশীপুরের জেটিতে লাগল। একদল থার্ড ক্লাস যাত্রী মাড়োয়ারী নেমে গেল, এবং তার চেয়ে আরও বড় একদল কলের কুলী, মিলের চিনে-মিস্ত্রী উঠে এল। অবিন ডেকের এধার থেকে ওধারে একবার পায়চারি করে নিয়ে ফিরে এসে বল্লে—

"এই ছবিটা রাবিস্ বলে নিশ্চয়ই বৌবাজারে পুরোনো জিনিষের

সঙ্গে চালান যে'তো, কিন্তু যে-ঘরের দেয়ালে এটা খাটানো ছিল, সেই ঘরটার ইতিহাসটা বেশ-একটু রকমওয়ারি রকমের ছিল বলেই সে ঘরটায় আমি কোনো অদল-বদল ঘটতে দিইনি। আমাদের যিনি ছোটকর্তা, তাঁরই সেটা বৈঠকখানা। এই ছোট-কর্তাই আমাদের সেকালের শেষ-ঐশ্বর্য্যের বাতিগুলো দিনের বেলায় ঝাড়ে-লণ্ঠনে জ্বালিয়ে-জ্বালিয়ে নিঃশেষ করে দিয়ে গেছেন; এবং নিজের হাতের হীরের আংটির বড়-বড় আঁচড়ে বিলিতি আয়নাগুলোকে সেই সব দিনকে রাত, রাতকে দিন করবার ইতিহাসের সন তারিখ এবং নামের তালিকায় ভরে দিয়ে গেছেন। এই কর্তার বাবুগিরির কীর্তিকলাপের গল্প ছেলে-বেলায় আরব্য-উপন্যাসের মতোই আমার কাছে লাগতো; এবং বড় হয়ে যখন আমি এই ঘরের চাবি খুলুম, তখন গোলাপী-আতর-মাখানো পুরোনো কিংখাবের গন্ধ-ভরা একটা অন্ধকারের মধ্যে এই ছবির দুটি কালো চোখ আমার দিকে এমনি একটা উৎকণ্ঠা নিয়ে চেয়ে রইল যে সে-ঘরটায় কোনো অদল-বদল করতে আমার সাহস হল না। কিন্তু সে-ঘরটাকে তালা-বন্ধ করে ফেলে রাখতেও আমার ইচ্ছে ছিল না। বাড়ির মধ্যে সেই ঘরটা সব-চেয়ে আরামের,—একেবারে ফুল-বাগানের ধারেই; দক্ষিণের হাওয়া এবং পুবের আলোর দিকে সম্পূর্ণ খোলা ঘরখানি! আমি সেই-খানেই আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধব নিয়ে খাস-মজলিস—সেকালের মতো নয়, একালের ক্লাব-রুমের ধরণে—গড়ে তুল্লেম। আমরা

সেই সাবেক-কালের নাচ-ঘরটার বসে চা-চুরুটের সঙ্গে পলিটিক্স সোসিওলজি থিওলজি এবং জার্মান-ওয়ারের চর্চায় ঘোরতর তর্কযুদ্ধে যখন উন্মত্ত হয়ে উঠেছি তখন হঠাৎ এক-একদিন এই ছবিখানার দিকে আমার চোখ পড়লেই সেকালের বিলাসিতার সাজসরঞ্জামের মধ্যে বিলাতী কেতায় আমাদের এই একালের মজলিস এত কুশ্রী বোধ হত—দুই কালের ব্যবধানটা এমন স্পষ্ট হয়ে দেখা দিত যে আমাতের তর্ক আর অধিক দূর অগ্রসর হতো না। আমাদের মনে হত এ ঘরের স্বামী যিনি, তাঁর অবর্ত্তমানে অনাহুত আমরা একদল এখানে অনধিকার প্রবেশ করে গোলমাল বাধিয়েছি; এখনি যেন বাবুর খানসামা এসে আমাদের এখান থেকে ঘাড়-ধরে বিদায় করে দেবে। মনের এই সন্ত্রস্ত ভাব নিয়ে ও-ঘরখানার মধ্যে আড্ডা জমিয়ে তোলা অসম্ভব দেখে আমার বন্ধুরা বলতে লাগল—'ওহে অবিন্, তোমার ভাই ওই মোহিনীকে এখান থেকে না নড়ালে চলছে না; ওর ওই ভূতুড়ে-রকমের চাহনিটায় আমাদের এখানে স্থির হয়ে থাকতে দেবে না দেখ্‌ছি।' কিন্তু বন্ধুদের অনুরোধ রক্ষে হল না;—মোহিনী সেখানকার সেইখানেই রহিলেন; বন্ধুরা একে-একে সরে পড়তে থাকলেন। এই সময় আমার মনে হতো—একালটা যেন একটা খোলসের মতো আস্তে-আস্তে আমার চারিদিক থেকে খসে যাচ্ছে, আর আমার নিজ মূর্ত্তিটা পুরোনো খাপ থেকে ছোরার মতো ক্রমে বেরিয়ে আস্‌ছে। আমার মধ্যে যে সেকালটা ছিল, সে যেন

দিনে-দিনে প্রবল হয়ে উঠছে;—বুঝছি আমার রক্তের সঙ্গে সেকালের বিলাসিতার গোলাপী আতর এসে মিশ্‌ছে, আমার দুই চোখের কোণে উদ্দাম বাসনার অগ্নিশিখা কাজলের রেখা টেনে দিচ্ছে! এই সময় আমি এক-এক দিন এই ছবিখানার দিকে চেয়ে-চেয়ে সারা রাত কাটিয়ে দিয়েছি। ঐ ছবির অন্ধকার ঠেলে ওপারে গিয়ে পৌঁছবার জন্যে—ঐ কালোর মাঝখানে যে সুন্দর চোখ, তারি আলোক-শিখায় নিজেকে পতঙ্গের মতো পুড়িয়ে মারবার জন্যে আমার দেহ-মন আবেগে থর-থর-করে কাঁপ্‌তো। আমার মনের এই তিমিরাভিসার বন্ধুরা পাগলামির প্রথম-লক্ষণ বলে ধার্য্য করে নিয়ে আমাকে সাবধান কল্লেন, উপহাস কল্লেন, নানাপ্রকার উত্ত্যক্ত করে ভয় দেখিয়ে শেষে আমার ভরসা ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র গমন কল্লেন—যেখানে চায়ের এবং চুরুটের আড্ডা ভালো জম্‌তে পারে।

আমি একলা ঘরে; আর আমার মনের শিয়রে অন্ধকারের পর্দ্দার ওপারে—মোহিনী! যবনিকা তখনো সরেনি, চাঁদ তখনো ওঠে নি। এ সেই-সব দিনের কথা হৃদয়তন্ত্রীতে যখন মিনতির সুর অন্ধকারে লুটিয়ে পড়ে বিনয় করছে—"এসো এসো, দেখা দাও।" একখানা ছবি, তাও আবার প্রায় ষোলো-আনাই ঝাপ্‌সা—সে যে এমন করে মনকে টান্‌তে পারে, এটা আমার নিজেরই স্বপ্নের অগোচর ছিল;—বন্ধুদের কথাতো দূরে থাক। বল্লে বিশ্বাস করবে না, তখন বসন্তকালে ফুলের গন্ধ যদি আস্‌তো

আমার মনে হতো ঐ ছবিখানার মধ্যে যে আছে, তারি যেন মাথা-ঘসার সুবাস পাচ্ছি। হাফেজ যে সজীব ছবিটি দেখে দেওয়ানা হয়েছিলেন, তার চেয়ে পটের অন্দরে লুকিয়েছিল যে-'মোহিনী' সে যে কম জীবন্ত, কম সুন্দরী, তাতো আমার মনে হতো না। নীল ঘেরাটোপ-দেওয়া খাঁচার মধ্যেকার সে আমার শ্যামা পাখী!—তার সুর আমি শুনতে পাই, তার দুখানি ডানার বাতাসে নীল আবরণ দুলছে দেখতে পাই। আমার প্রাণের কান্না সে গান দিয়ে সাজিয়ে, সুর দিয়ে গেঁথে আমাকেই ফিরে দেয়—কেবল চোখে দেখা আর দুই বাহুর মধ্যে—বুকের মধ্যে এসে ধরা-দেওয়ার বাকি!"

এতটা বলে অবিন হঠাৎ চুপ কল্লে। তখন আধখানা নদীর উপর থেকে কুয়াশা সরে গিয়ে জলের গায়ে সকালের আকাশ থেকে বেলফুলের মতো সাদা আলো এসে পড়েছে, আর আধখানা নদীর বুকে ভোরের অন্ধকার টল্‌টল্‌ করছে—এরি মাঝে দুই ডিঙায় দুই জেলে কালোর আলোর বুকে জাল ফেলে চুপ-করে বসে রয়েছে দেখছি। আমাদের জাহাজ থেকে একটা ঢেউ গড়িয়ে গিয়ে ডিঙা দুখানাকে খুব-একটা দোলা দিয়ে চলে গেল। অবিন সুরু কল্লে—

"শুনেছিলেম তান্ত্রিক সাধকেরা না-কি মন্ত্রবলে জড়ে জীবনদান, অদৃশ্যকে দৃশ্য করে তুলতে পারেন; আমি আমার মোহিনীকে মন্ত্রবলে কাছে—একেবারে আমার চোখের সমুখে—টেনে আনবার

জন্য এমন-এক সাধকের সন্ধান করছি, সেই সময় আমার এক আর্টিষ্ট বন্ধুর সঙ্গে দেখা। তাঁর সঙ্গে কথায়-কথায় 'মোহিনী'র ছবিটা যে কেমন-করে আমাকে পেয়ে বসেছে সেই ইতিহাস উঠল। বন্ধু আগাগোড়া ব্যাপারটা আমার মুখে শুনে বল্লেন—"তোমার দশা সেই গ্রীসদেশের ভাস্করটার সঙ্গে মিলছে দেখছি!" আমি বল্লেম—"তার সামনে তো তবু তার 'মোহিনী' প্রাণটুকু ছাড়া আর-সমস্তটা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল; কিন্তু আমার 'মোহিনী' যে অবগুণ্ঠনের আড়ালেই রহে গেছে হে! এর উপায় কিছু বাৎলাতে পার?" বন্ধু আমায় উপায় বাৎলে—বাড়ী গিয়ে এক-শিশি আরক আমাকে দিয়ে পাঠালেন। সেকালটা যদিও আমাকে বারো-আনা গ্রাস করেছিল তবু মনের এক-কোণে একালের বিজ্ঞানটার উপরে একটু যে শ্রদ্ধা, তা তখনো দূর হয় নি। আমি বন্ধুবরের কথা-মতো ঘড়ি-ধরে হিসাব করে সেই আরকটা সমস্ত 'মোহিনী'র ছবিখানায় ঢেলে দিলেম। সে-আরকটার এমন তীব্র গন্ধ যে আমায় যেন মাতালের মতো বিহ্বল করে তুল্লে। তারপর কখন যে অজ্ঞান হয়ে পড়েছি তা মনে নেই। এইটুকু মাত্র জানি যে আরক ঢালবার পরে 'মোহিনী'র ছবিখানা ধোঁয়ায় ক্রমে ঝাপ্‌সা হয়ে আসছে; আর আমি ভাবছি এইবার মেঘ কাটলো।

একমাস পরে কঠিন রোগশয্যা থেকে শেষে নিষ্কৃতি পেয়ে আর-একবার এই ছবিখানার দিকে চেয়ে দেখলেম, সেটার উপর থেকে

সেই ফার্স্টক্লাসের ঘুপ্‌সি ডেক্—সেখানে বসে গঙ্গাও দেখা যায় না, আকাশের নীলও চোখে পড়ে না ; মনে হয় যেন প্রকাণ্ড একটা হাঙরের পেটের ভিতর বসে চলেছি;—তার উপর সেখানে অবিনের ওই পুস্তিন্‌পরা মানুষটি! আমরা ক'টি ঝোড়ো-কাকের মতো নিজের-নিজের ডানায় মুখ-লুকিয়ে দিন কাটাচ্ছি এমন সময় কেল্লার একটা খুব বড় ইংরেজ, জার্নেল কি কার্ণেল হবে, ঝাপ্পা-ঝোপ্পা ইউনিফারমের উপরে পালক-দেওয়া টুপি এবং খোপনা-বাঁধা তলোয়ার ঝুলিয়ে জাহাজে উঠেই সেই লোকটাকে দেখে বল্লে—"হ্যালো, তুমি যে এখানে ?"

লোকটা অতি বিশুদ্ধ ইংরেজিতে উত্তর কল্লে—"আমি এখানে কেননা আমার যাবার আর কোথাও বাকি নেই। এই জাহাজখানা আমি পোর্ট-কমিশনারদের বেচে ফেলেছি কিন্তু এর মায়াটা এখনো কাটাতে পারিনি তাই এটায় চড়ে দুই-সন্ধ্যা বেড়াই। এখানা এক বছর গার্ডেনরীচের ঐ দিকে আমার বাড়ির কাছ দিয়েই ডায়মণ্ড-হারবারে যাওয়া-আসা কচ্ছিল, এদিকের একখানা জাহাজ বে-কল হওয়ায় এরা এটাকে এখানে এনেছে। জাহাজের সঙ্গে আমিও দক্ষিণ থেকে উত্তরে—ব্রীজের ওপার থেকে এপারে এসে পড়েছি ; তোমার সঙ্গে দেখা হল সুখী হলেম।"

তখন কাশীপুরের গন্‌ফাউণ্ডারির ঘাটে এসে জাহাজ ভিড়ছে, সাহেব সেই লোকটাকে টাইম্ কি জিজ্ঞাসা করলে। সে জেব্ থেকে একটা প্রকাণ্ড ম্যাকেব ওয়াচ বার করে বল্লে—"আটটা

পঞ্চাশ।" ঘড়িটা আগাগোড়া হীরের মোড়া এবং তার চেন্‌টা সমস্তটা পান্না আর চুনি গাঁথা। সকালের আলো সে-দুটোর উপরে পড়ে বিদ্যুতের মতো ঝক্‌-করে উঠল। সাহেব গুড্‌মর্ণিং বলে কাশীপুরে নেমে গেল। সেই লোকটা অন্যমনস্ক-ভাবে সেই ঘড়ি আর চেন দুই-আঙুলে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে গঙ্গার দিকে চেয়ে আপনার মনে বিড়-বিড় করে কি বকৃতে লাগল।

কারো কাছে কিছু নতুন দেখলে অবিন সেটাকে অন্তত ঘণ্টা-খানেকের জন্য কেড়ে না নিয়ে থাকতে পারেনা জানতেম; কিন্তু সে আজ যে এমনটা করবে তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। সাহেব নেমে যেতেই অবিন হঠাৎ সেই লোকটার হাত থেকে ঘড়ি আর চেন ছোঁ-মেরে টেনে নিয়ে নিজের পকেটে পূরে দিয়ে গট্‌ হয়ে বসল;— আমার মনে হল যেন একটা আগুনের সাপ অবিনের বুকের পকেটে গিয়ে লুকুলো। লোকটা কি মনে করছে এই ভেবে আমার দুই কান লাল হয়ে উঠেছে; অবিন কিন্তু দেখি চোখ-বুজে স্থির হয়ে বোসে। আর সেই লোকটা একটু নড়লেনা-চড়লেনা, অবিনের দিকে ফিরেও দেখলে না,—উল্টোদিকে মুখ-ঘুরিয়ে পায়ের উপর পা দিয়ে যেমন ছিল তেমনই রইল; আর দেখলেম তার দুটো আঙুল ঘড়ি-চেনটা নিয়ে যেমন ঘুরছিল এখনো তেমনি আস্তে-আস্তে শূন্যে ঘুরছে। কড়া-কথা, মিষ্ট-কথা, মিনতি এবং বিনতি সব যখন হার মেনেছে, তখন আমি অবিনকে বল্লেম—"তোমার সঙ্গে এই পর্য্যন্ত।" বলেই আমি তার দিকে পিঠ-ফিরিয়ে বসলেম।

কতক্ষণ এমন কাটলো মনে নেই। একটা সাদা পাখী ঢেউয়ের উপর, পদ্ম থেকে ছেঁড়া পাপড়িটির মতো, ভেসে বেড়াচ্ছে, আমি সেই দিকে চেয়ে রয়েছি, এমন সময় অবিন আমার পিঠে একটা মস্ত থাবড়া বসিয়ে দিয়ে চুপি-চুপি বল্লে—"ওহে, পকেট থেকে চেনটা কোথায় পড়ল দেখেছো!"

সাপে ছোব্‌লালে যেমন, আমি তেমনি চম্‌কে উঠলেম; দেখলেম ভয়ে অবিনের মুখ সাদা হয়ে গেছে। আমার দুই চোখ চকিতের মতো ডেকটার একধার থেকে আর-একধার যেন ঝেঁটিয়ে নিলে। শিরিস্‌-কাগজ-করা সেগুন-কাঠের সরু তক্তাগুলো এবং পিচ্‌ঢালা তাদের জোড়ের সেলাইগুলো এমন অতিরিক্ত স্পষ্ট হয়ে কোনো দিন আমার দৃষ্টিতে পড়েনি। অবিনও তার পায়ের কাছে জমা-করা জাহাজের মোটা কাছিটা যেন আনমনে পা-দোলাতে একটু-খানি সরিয়ে দেখলে এবং বুক থেকে হঠাৎ খসে-পড়া গোলাপ ফুলটা কুড়োবার অছিলায় বেঞ্চের তলাটাও একবার বেশ-করে হাত-বুলিয়ে নিলে বটে কিন্তু কোথাও আর সেই ঘড়ি, তার সাপ-খেলানো চেনের লেজুড়ের ডগাটি পর্য্যন্ত নেই! এ-দিকে দেখছি কুঠিঘাটার পন্টুনে মৌমাছির ঝাঁকের মতো লোক জাহাজটা ধরবার অপেক্ষায়। আর-একটু পরেই লোকের পায়ের তলায় অবিনের এই মহামূল্য বিপদ গুঁড়িয়ে ধূলো হয়ে যাবে এটা ভেবে আমার লজ্জাও যেমন হচ্ছে তেমনি আর-একটু পরেই অবিনকে নিয়ে ভিড়ের মধ্যে গা-ঢাকা দিতে পারবো ভেবে খানিকটা ফুর্ত্তি

এবং সাহসও হচ্ছে, এমন সময় সেই লোকটা বেশ ধীরে-সুস্থে বেঞ্চি থেকে উঠে বরাবর থার্ড ক্লাসে ইঞ্জিন-ঘরের ধারে লালপাগ্‌ড়ি এক-জন রিভার-পুলিশের জমাদারের সঙ্গে কে জানে খানিকটা কি ফুস্-ফাস্ করে আবার আস্তে-আস্তে নিজের জায়গা এসে দখল করলে! কুঠিঘাটায় তখন লোক উঠতে সুরু হয়েছে। পাহারাওয়ালা-সাহেব ফার্ষ্ট ক্লাসে আসবার রাস্তাটা আগ্‌লে দাঁড়িয়ে জাহাজের একজন ছোকরা টিকিট-কালেক্‌টারের সঙ্গে কিস্-ফাস্ করে কি যে বলাবলি করতে লাগল তা শুনতে পেলেম না; অবিনও চোখবুজে কি ভাবতে লাগল তা আমি জানি না; কিন্তু আমি আমার দুই পকেটে হাত গুঁজে বুট জুতোর সুক্‌তলা থেকে মাথার উপরে টুপি-ঢাকা ব্রহ্ম-তেলো পর্য্যন্ত একটা শীত অনুভব করতে লাগলেম। জাহাজ পুরো-দমে কলকাতার দিকে চলেছে, তার সমস্তটা একটা রুদ্ধ আবেগে থর-থর করে কাঁপছে,—যেন সে আমাদের যত শীঘ্র পারে বড়-বাজারের পন্টুনে হাজির কল্লে বাঁচে!—যেখানে নিকলের বোতাম-আঁটা কালো কোর্ত্তা গায়ে সাহেব-কনষ্টেবল কটা চোখের স্থির দৃষ্টিটা নিয়ে প্রতীক্ষা করে রয়েছে। এমন সময় অবিন হঠাৎ চেঁচিয়ে বলে উঠল—"দেখুন তো আপনার ঘড়িতে কটা?" সমস্ত পৃথিবী ক্ষণকালের জন্ম চলা-বলা বন্ধ করে আমার দুই চোখের চসমার কাঁচের মধ্যে দিয়ে সেই লোকটার দিকে যেন চেয়ে দেখলে। লোকটা তার জেব থেকে সেই হীরের ঘড়ি মায় চেন্ হারানিধির মতো অবিনের দিকে বাড়িয়ে ধরে বল্লে—"দশটা বিশ হল।"

ঝমাঝম্ বাদলা হঠাৎ কেটে সূর্য্য উঠলে যেমন সব পাখীগুলো এক-সঙ্গে ডেকে ওঠে, তেমনি জাহাজের যাত্রীদের কোলাহল, কলের হস্-হাস্, জলের কল্-কল্ সমস্ত একসঙ্গে এসে আমার মনের মধ্যে গণ্ডগোল বাধিয়ে দিলে ;—অবিন যে কখন উঠে সেই লোক-টিকে ধন্যবাদ দিয়ে আহিরিটোলায় নেমে গেল তা আমি দেখতেও পেলেম না।……

আমাদের কুঁড়েমির বাসাটা ভেঙে গেছে। অবিন আর আসে না—যদিও কোনোদিন আসে তো ঘড়ি-ধরে বাড়ি ফেরে। অবি-নের সঙ্গে-সঙ্গে বিশ্বের নবীন এবং প্রবীণের দল একে-একে গা-ঢাকা হল ;—পড়ে রইলেম কেবল আমি,—নবীন ও প্রবীণ দুই দলেরই অবশেষ, উল্টে-পড়া মদের পেয়ালায় তলানি একটি ফোঁটা!

ইয়ারকির শেষ-নাড়িচ্ছেদ বুড়ো-গোলোকবাবুর সঙ্গে সম্পূর্ণ করে আমি আমার সেই আগেকার জাহাজে আজকের সকালে ঠিক সেই আগেকারই মতো একলাটি এসে বসেছি। এতদিন যেন শীতে একটা বদ্ধ ঘরের মধ্যে আগুন-তাতে বাস করছিলেম, হঠাৎ আজ দরজা খুলে বেরিয়ে এসে দেখছি বসন্তকাল জলে-স্থলে ঢেউ দিয়ে বইছে। মন-ভোলানো ফাগুনের হাওয়া, বসন্তবাউরীর সবে-ওঠা কচি ডানার মতো হল্‌দে রোদ এখনো শীতে কাঁপছে। আমি তারি দিকে চেয়ে একলাটি আমার সেই আগেকার জায়গায় চুপ-করে বসে-বসে দেখছি—সব নৌকার ফুটো-ফাটা নতুন-পুরাতন-নির্ব্বিশেষে পালগুলোতে আজ নতুন দখিনে হাওয়া বেধেছে, নদীর

বুকে যৌবনের জোয়ার তুফান তুলেছে, জলের ফেনা যেন ফুলের সাদা সাজ! বাইরের এই শোভার মধ্যে আপনাকে হারিয়ে, আপনাকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়ে আছি, এমন সময় একটা প্রাণখোলা পরিষ্কার বাতাস নদীর এক-আঁজলা ঠাণ্ডা জলের ঝাপ্‌টায় আমার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত ভিজিয়ে সমস্ত ডেকটা একবার জলের ছড়া দিয়ে দিয়ে ধুয়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে একটা গোলাপফুলের খোস্‌বো চারিদিকে ছড়িয়ে সেই সে-হাঙরমুখো ষ্টীমারের লোকটি বাসন্তী রঙের একখানা রুমালে মুখ-মুছতে-মুছতে দেখা দিলেন। লোকটির চেহারা যে এত সুন্দর ইতিপূর্ব্বে তা আমার চোখেই পড়েনি। আজ গোলাপী সাটিনের সদ্‌রী, বাসন্তী রঙের ফিন্‌ফিনে ঢাকাই মস্‌লিনের বুটিদার চাপকান, তার উপরে চিকনের কাজকরা হাল্কা টুপিটি পোরে মূর্ত্তিমান বসন্তের মতো তাঁকে দেখতে হয়েছে। সিংহের মতো সরু কোমর, দরাজ বুক নিয়ে লোকটি আমার পাশেই এসে বসলেন। আমি তাঁকে একটা সেলাম না দিয়ে থাকতে পাল্লেম না। তিনি একটুখানি হেসে আমার দিকে একবার ঘাড় নীচু করে চাইলেন। সেই সময় তার চোখছুটো দেখলেম যেন একটা স্বপ্নের জাল দিয়ে ঢাকা। এমন চোখ আমি কারু দেখিনি,—এ যেন আমার দিকে চেয়ে দেখছে বটে, দেখছে-নাও বটে! তখন সেই আচ্ছন্ন চোখের দৃষ্টি, সেই বাসন্তী কাপড়ের আভা, আর সেই রুমালে-ঢালা গোলাপফুলের রং আমাকে এমন বিহ্বল করেছে যে আমার মনে পড়েনা তাঁকে আমি কোনো প্রশ্ন করেছিলেম

কি না। তিনি যেন আমার প্রশ্নেরই জবাবে বল্লেন, তবে শুনুন—

"আমার বংশে কেউ কখনো স্বপ্ন দেখতো না। এটা শুনে আপনি আশ্চর্য্য হবেন না। পাঁজরের যে হাড়খানায় স্বপ্নের বাসা, সেই হাড়টা হাফেজের মতো কোনো মহাকবির অভিশাপে আমাদের আদিপুরুষের বুক থেকে খসে পড়েছিল; সেই থেকে বংশানুক্রমে আমরা ভয়ঙ্কর-রকম কাজের মানুষ হয়ে জন্মাতে লাগলুম। বুকের ঐ হাড়, যেটাকে স্বপ্ন এসে বাঁশীর মতো ফুঁ-দিয়ে বাজিয়ে তোলে, সেটা আর আমাদের কারু মধ্যে গজাতে পেলেন। জন্মের সঙ্গে-সঙ্গেই কাজে দক্ষতার একটা শিলমোহর বুকে নিয়েই যেন আমাদের বংশের সব ছেলেগুলো ভূমিষ্ঠ হতো এবং আমাদের মধ্যে কোনো ছেলের বুকে যদি কখনো ঐ হাড়ের বাঁশীর অঙ্কুরমাত্র আছে এরূপ সন্দেহ হতো, তবে হাকিম এবং বুজরুগ ডেকে সেই শিশু-বুকে একটা তপ্ত লোহার শলা চালিয়ে স্বপ্নের অঙ্কুর দগ্ধ করে দিতে আমাদের কেউ কোনোদিন ইতস্তত করেন নি, যদিও স্বপ্নের সন্দেহে অনেক-সময় শিশু-প্রাণগুলি পুড়ে ছাই হতে বিলম্ব হয়নি। আমাদের যারা কেউ নয়, তারা এজন্যে হাহাকার করতো, এবং এর জন্যে আমাদের বংশে অনেক মায়েরও বুক ফাটতো সন্দেহ নেই, কিন্তু কোনো পিতার তাতে এক-নিমিষের জন্য কাজে একটু শৈথিল্য এসেছে বলে তো আমার বিশ্বাস হয় না। পুরুষানুক্রমে কাজ থেকে রস টেনে নিয়ে

আমাদের বুকের হাড়গুলো বাজ-ধরবার শিকের মতো সরু, কালো এবং নিরেট হয়ে উঠেছিল।

এই বংশের শেষ-সন্তান আমি যখন ভূমিষ্ঠ হলেম তার ছমাস পূর্ব্বে পিতা আমার স্বর্গারোহণ করেছেন এবং আমায় প্রসব করে মা আমার কঠিন রোগশয্যায় শুলেন, কাজেই আমার বুকের ভিতরে স্বপ্নের বাঁশী যদি থাকে সেটা নিয়ে আমি বেড়ে উঠতে কোনো বাধাই পেলেম না। শুকনো ডালের শেষ-পল্লবের মতো আমি, আমার মধ্যে দিয়ে হয়তো এই অভিশপ্ত বংশের অসংখ্য বিফল স্বপ্নগুলো শেষফুলটির মতো একদিন ফুটে উঠতেও পারে এই ভেবে মা আমার এক-এক দিন রোগশয্যার কাছে আমাকে ডেকে তাঁর শীর্ণ হাতখানা আমার বুকের উপর আস্তে-আস্তে বুলিয়ে দেখতেন। সে-সময় তাঁর দুই চোখ রোগের কালিমার মাঝে এমন-একটা উৎকট আশঙ্কা নিয়ে আমার দিকে চেয়ে থাকত যে আমি ভয়ে এক-একদিন কেঁদে ফেলতুম। মা আমার চোখে জল দেখে আরামের একটা নিশ্বাস ফেলে আমায় ছেড়ে দিতেন। আমার বংশে কেউ কোনোদিন চোখের জল ফেলেনি, সেটাকে তাঁরা স্বপ্নের অঙ্কুরের মতো সম্পূর্ণ অকেজো বলেই গণ্য করতেন।

মা দুঃসাধ্য রোগে বিকল; কাজেই সেই অল্পবয়স থেকেই আমি কাজের মানুষ হয়ে উঠলুম। কাজের চাপনে আমার সমস্ত বুকটা যখন কলের চাপে পাটের গাঁটের মতো নিরেট শক্ত হয়ে ওঠবার যোগাড়, যে-সময় কাজের মধ্যে আমি এমন-একটু অবসর পাচ্ছিনে

যে রোগা মায়ের মৃত্যুশয্যার পাশে গিয়ে একটুও সময় নষ্ট করি, যখন মা-আমার অসময়ে হঠাৎ মরে অসমাপ্ত কাজের কোনো ব্যাঘাত না ঘটান এই প্রার্থনাটা আমার মনে নিত্য জাগছে, সেই সময় পাটের বাজারে একটা বিষম দাঁও-প্যাঁচের মাঝখানে মায়ের আসন্ন মৃত্যুর খবরটা আমার অফিস-ঘরে এসে পৌঁছল। বলা বাহুল্য সেখান থেকে আমার কাজ অসমাপ্ত রেখে তখন নড়বার সাধ্য ছিল না। যে-সাহেবের সঙ্গে সেদিন দেখা, তিনি তখন আমাদের ডাক্তার ছিলেন। আমি একখান চিরকুটে আমার কাজ সেরে আসা পর্য্যন্ত তাঁকে মায়ের খবরদারি করতে লিখে পাঠিয়ে কাজে মন দিলেম। আর-কেউ হলে সব কাজ ফেলে মুমূর্ষু মায়ের কাছে ছুটে যেতো কিন্তু আমি জানতুম আমি সেই নিরেট বাঁশের শেষ কঞ্চি—বাঁশী হয়ে বাজা যার পক্ষে অসম্ভব!

কাজ-চুকিয়ে বাড়ি ফিরতে প্রায় দশটা হল এবং বাড়ি এসে কাপড় ছেড়ে জলযোগ করে নিতে আরো খানিকটা সময় অতীত হল। আমি যখন মায়ের ঘরে গেলেম তখন রাত গভীর হয়েছে। মাকে যে জীবন্ত দেখতে পেলেম সেজন্ত আনন্দ হল না; তিনি যে আমার কাজ-সারা হবার মাঝেই সরে গিয়ে কোনো অসুবিধা ঘটান নি সেটাতেই আমার আনন্দ। আমি ঘরে ঢুকতেই তিনি আমাকে বল্লেন—"ওই বাক্সটা এখানে আন্।" বাক্সটা তাঁর সম্মুখে ধরে দিতেই তিনি কি-একটা বার করে আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে বল্লেন—"তুই কখনো স্বপ্ন দেখিস্?"

বাক্সটার ভিতর আমি দেখলেম শূন্য। আমার মনে হল মায়ের কথার কি উত্তর দেব সেইটে শোনবার জন্যে সেই লোহার বাক্সটা যেন হাঁ-করে আমার দিকে চেয়ে রয়েছে। আমি হোঃ হোঃ করে হেসে বল্লেম—"কোনো-পুরুষে স্বপ্ন কাকে বলে জানিনি।" আমার মনে হল আমার কথা শুনে মায়ের বুকের ওঠা-পড়া হঠাৎ বন্ধ হল, তার পর আস্তে-আস্তে তাঁর ডান-হাতের মুঠো সজোরে কি যেন আঁকড়ে ধরলে।

তার পর যা ঘটল সেটার জন্যে আমি একেবারেই প্রস্তুত ছিলেম না। একটা ঝড় যেন প্রচণ্ডবেগে ধাক্কা দিয়ে আমার ভিতরে জমাট-বাঁধা কান্নাকে হঠাৎ ঠেলে বার করে দিলে। আমার পাঁজরের সমস্ত হাড়গুলো তল্‌তা বাঁশের বাঁশীর মতো করুণ সুরে সহসা বেজে উঠলো। আর আমার সেই মরা-মায়ের ডান-হাত আস্তে-আস্তে তাঁর নিজের বুকের উপর থেকে উঠে ক্রমে-ক্রমে আমার বুকের উপরে এসে আস্তে-আস্তে আপনার মুঠো খুল্লে। তার ভিতর রয়েছে দেখলেম আব্‌দ্ আল্লা লেখা আমার অভিশপ্ত অতি-পুরাতন পূর্ব্বপুরুষের বুকের হাড়! তার গায়ে সাত-আটটা ছোট ছোট ফুটো। সেই দিন সব-প্রথম লোকে আমাদের বাড়ি থেকে কান্নার করুণ সুর শুনতে পেয়েছিল। আর সেই দিন আমি প্রথম জানতে পারেম আমার বুকের ভিতরে সব হাড়গুলো বাঁশীর মতো ফাঁপা ও ফুটো, কান্না দিয়ে সেগুলো বোজানো ছিল মাত্র—"

গলার একটা জলের ঝাপ্‌টা হঠাৎ ষ্টীমারের ডেক্ ভিজিয়ে

আমাকে ঠাণ্ডা জলের ছিটেয় একেবারে ভিজিয়ে দিয়ে গেল। আমি হঠাৎ চম্‌কে উঠে চারিদিক চেয়ে দেখলেম, একটা গোলাপ ফুল আমার পাশে পড়ে আছে; কিন্তু সে-লোকটার চিহ্নমাত্র কোথাও নেই। তার পর দিন অবিনের সঙ্গে দেখা হতে সে বল্লে —"ওহে কাল কি তুমি স্বপ্নে ভোর ছিলে ? পাশের ষ্টীমার থেকে গোলাপ-ফুলটা তোমার গায়ে ছুঁড়ে মাল্লেম, তাতেও তোমার চৈতন্য হল না, অবাক্ !"

গুরুজী

আজ অবিনের গুরুর কাছে সে আমাকে নিয়ে যাবে। শুনেছি তিনি মহা সাধুপুরুষ এবং জাতিস্মর। আমি সেদিন আমার গেরুয়া মলিদার ওভার-কোটটার উপরে আজ-কালের স্বামীজীর ধরণে পাগড়িটা বেঁধে, পকেটে কবীরের পুঁথিখানা নিয়ে, জাহাজে গিয়ে চড়লেম। নাকে সোনার চশমা এবং হাতে রূপো-বাঁধা শুয়োরের দাঁতের ছড়ি আর পায়ে ফ্লানেলের পেণ্টালুনের নীচে ব্রাউন-লেদার বুটটায় আমাকে ফকির কি ফিকিরবাজ পুলিসের সি-আই-ডি অথবা আর-কিছু দেখাচ্ছিল তা আমি ঠিক বলতে পারিনে; তবে আমার মনের ভিতর সেদিন যে একটু গেরুয়ার আভা পড়েছিল এবং আমি গান-বাজনা না করে খুব গম্ভীর হয়ে

বসে থাকায় জাহাজে তাবৎ যাত্রী আমার দিকেই যে থেকে-থেকে কটাক্ষপাত করছে এটা আমি বেশ বুঝছিলেম। বুড়ো গোলোকবাবু সেদিন খবরের কাগজটা চশমার অতটা কাছে নিয়ে কেন যে অমন মনঃসংযোগ দিয়ে জুটের বাজার-দরের কলম্‌টা আগাগোড়া মুখস্থ করছিলেন সেটা জানতে আমায় অধিক কষ্ট পেতে হয়নি।

যাই হোক, অন্তদিনের মতো সেদিনও নিয়মিত উত্তরপাড়ায় এসে জাহাজ ভিড়লো। অবিনে-আমাতে সেখানে নেমে পড়ে থার্ড এবং ফোর্থ এই দুই ক্লাসের মাঝামাঝি গড়নের ছকড় গাড়িতে ধুলো এবং ঝাঁকানি খেতে-খেতে আধক্রোশ-টাক্ গিয়ে রাজাদের একটা বাগান-বাড়ির ফটকের সাম্‌নে গাড়ি, ঘোড়া, আর গাড়োয়ান আমরা দুজনে খানার ভিতরে উল্টে পড়লেম। একখানা মোটরগাড়ি একরাশ ধুলো আর খানিক পেট্রোলের বিকট গন্ধ আমাদের নাক-চোখের উপরে ছড়িয়ে দিয়ে সাঁ করে বেরিয়ে গেল। অবিন সেই পলায়িত মোটরের চলন্ত ধুলোর মধ্যে আরো গোটাকতক ইংরাজি গালাগাল মিশিয়ে দিয়ে আমাকে চাকা-ভাঙা গাড়ির ভিতর থেকে টেনে বার করে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে দিলে। আমার চশমার একখানা কাঁচ গেছে ভেঙে, পাগড়িটা গেছে খুলে, এবং শুয়োরের দাঁতটা খসে গিয়ে আমার লাঠিটা হয়ে পড়েছে ফোগ্‌লা। অবিন আমার চেহারা দেখে হো-হো করে হেসে উঠল। আমি গায়ের ধুলো যথাসম্ভব ঝেড়ে-ঝুড়ে অবিনের দিকে

চেয়ে দেখলেম সে যেমন ফিট্-ফাট্ হয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল তেমনি আছে ;—তার কালো কোটের একটি ভাঁজও এদিক-ওদিক হয়নি এবং তার বুকের মাঝে ফুটন্ত গোলাপ-ফুলটি থেকে একটি পাপ্‌ড়িও ঝরে পড়েনি। অবিন লম্বায় চওড়ায় আমার চেয়ে বেশী বই কম হবে না, অথচ ঐ ছক্কড় গাড়িটার খাঁচা-কল থেকে কি-করে এমন সাফ্ বেরিয়ে গেল তা জানিনে ; কিন্তু তাকে দেখে আমার হিংসে হয়েছিল সত্যি বলছি। ধুলো-মাখা গেরুয়া-পাগড়ি ঝেড়ে-ঝুড়ে সাম্‌লে নিলেম বটে কিন্তু বাড়িতে আয়না দেখে যেমন চোস্ত করে সেটাকে বেঁধেছিলেম তেমনটা আর হল না ;—ব্রহ্মতেলোর মাঝখান থেকে কাপড়ের ফুঁপিটা সাপের ফণার মতো আর উন্নত হয়ে রইল না—বাঁ-কানের উপরে লট্‌কে পড়ল ; এবং এই আকস্মিক দশা-বিপর্য্যয়ে দেহটা অনেকখানি ধুলো মেখে নিলেও, মন তার নিজের গেরুয়া রংটুকু আর বজায় রাখতে পারলে না। অবিনের সঙ্গে সেই রাজার বাড়িতে সাধু-দর্শনে যখন প্রবেশ কল্লেম তখন মন আমার সম্পূর্ণ অসাধু এবং অধীর।

রং-ওঠা লোহার শিক-দেওয়া একটা ফটকের মাঝ দিয়ে ইটের খাদরী-করা চওড়া একটা রাস্তা খানিক সোজা গিয়ে বেড়ির মত ডাইনে-বাঁয়ে ঘুরে টালি-বসানো একটা বারান্দার চার ধাপ সিঁড়ির নীচে গিয়ে শেষ হয়েছে ; রাস্তাটায় এককালে লাল সুরকি ঢালা ছিল, এখন সেগুলো উড়ে গিয়ে জায়গায় জায়গায় সবুজ সেওলার ছোপ ধরেছে। রাস্তার ধারে-ধারে

পুরোনো গোটাকতক পাটা-ঝাউ এবং এখানে-ওখানে মাটির পরী রাখবার গোটা-দুচ্চার ইটের পিঁড়ে। পরীগুলোর মাটির দেহ বারো-আনা ক্ষয়ে গিয়ে ভিতরের শিক্গুলো বেরিয়ে পড়েছে। বাগানটা বাড়ির পিছন পর্যন্ত ঘুরে গিয়ে, একটা টানা রেলিঙের ভিতর দিয়ে যেখানে গঙ্গা দেখা যাচ্ছে সেইখানে একসার শুকনো গাঁদাফুলের গাছে গিয়ে শেষ হয়েছে। সিঁড়ির দুধারে সিংহি বসবার দুটো বড় চাতাল। একটার উপর থেকে সিংহি অনেক কাল পালিয়েছে—সেখানে একটা ছেঁড়া মাদুর রোদে শুকচ্ছে; আর-একটা চাতালে পোড়ামাটির মুখ-খিঁচিয়ে, এখনো এক পশুরাজ ভোম্বলদাস তার খসে-পড়া ল্যাজের সরু শিক্টা আকাশের দিকে খাড়া করে থাবাহীন এক পা শূন্যে উঁচিয়ে বসে আছে।

আমরা সিঁড়ির ক'টা ধাপ পেরিয়ে মোটামোটা তিনটে থাম-দেওয়া বারান্দা পেরিয়ে এক বড় ঘরে ঢুকলেম। ঘরটা খুব লম্বা, মাঝে বাঘ-থাবা পুরোনো মেহগ্নি-কাঠের মস্ত একটা গোল টেবিল—অনেকখানি ধুলো আর খুব জমকালো একটা চিনে-মাটির ফুলদান নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ফুলদানটার একটা হাতোল আর খানিকটা কানা ভাঙা; আর তার গায়ে বড়-বড় গোলাপ-ফুল, প্রজাপতি আঁকা। ঘরের ঝাড় ক'টা ময়লা গেলাপ দিয়ে মোড়া—আগে লাল, এখন ক্যালো সালুমোড়া শিকে ঝুলছে। ঘরের সবুজ খড়খড়ি ছিল; এখন ফিকে হতে-হতে দাঁড়িয়েছে প্রায় গঙ্গামৃত্তিকার রং। ঘরের পাশের দেয়ালগুলোতে একটা-

করে আয়না, একটা মেয়ের ছবি,—ছবির কোনোটার কাপড়-পরা, কোনোটা নয়। মাঝের দুই বড় দেয়ালে একদিকে একটা বড় ঘড়ি, আর-একদিকে চওড়া গিল্টির ফ্রেমে বাঁধা জরীর তাজ-মাথায় এক সুপুরুষের চেহারা,—মনে হচ্ছে যেন সামনের দেয়ালে সেই অনেক-দিনের-বন্ধ-হয়ে-যাওয়া ঘড়ির কাঁটা-দুটোর দিকে তিনি চেয়ে আছেন।

অবিন ঘরে ঢুকেই বাঁকা-পায়া গোল-পিঠ পাঁচ-রঙা-ফুল-কাটা ছিট্-মোড়া একখানা চৌকিতে ধপাস্ করে বসে পড়ল। দুজনে প্রায় এক কোয়ার্টার বসে আছি; অবিনের মুখে কথাই নেই। আমরা কেন যে এখানে এসেছি সেটা যেন অবিন ভুলেই গেছে। আমি বেগতিক দেখে—একটা উড়ে ঘরের একটেরে, যেখানে খানিক রোদ এসে পড়েছে, একটা সিগারেটের মরচে-ধরা টিনের কৌটো থেকে দোক্তার পাতা একটা-একটা বার করে রোদে মেলিয়ে দিচ্ছিল সেইখানে আস্তে-আস্তে গিয়ে বল্লুম—"সাধু কোথায় রে?" উড়েটা ঘাড় না উঠিয়েই, সাধু এই শব্দটি মাত্র উচ্চারণ করেই আবার নিজের কাজে মন দিলে। আমি আবার বল্লুম— "ওরে সাধু কোথায়? তাঁকে একবার খবর দে না!"

দাসো একবার পানের দাগ-ধরা লাল ঠোঁট দুটো কুঁচ্‌কে বল্লে—"সাধু? আম্মিই তো সাধু!"

আমার আর রাগ বরদাস্ত হলনা; আমি আমার ভাঙা ছড়িগাছটার বাকি অংশটা তার পিঠেই আজ ভেঙে যাব বলে

উচিয়েছি আর অবিন ডাকলে—"ওহে এদিকে।" ফিরে দেখি যাঁকে দেখবার জন্যে আসা তিনি দাঁড়িয়ে। চোখা-চোখি হবামাত্র তিনি একটুখানি হেসে কবীরের এই পরখটা সুর করে আউড়ে নিলেন—

"মন ন রঙ্গায়ে, রঙ্গায়ে যোগী কাপ্‌ড়া।"

আমার পকেটে কবীরের পুঁথি, এটা ইনি নিশ্চয় জেনেছেন; আর কথাগুলো আমাকেই বলা হল এই ভেবে আমি একটু বিস্মিত একটু ভীত আর একটু লজ্জিত হয়েই তাঁর পায়ে প্রণাম কল্লুম। তিনি হো হো করে হেসে উঠে বল্লেন—"ওহে অবিন, তোমার বন্ধু যবনের পায়ের ধূলো নিয়ে ফেল্লেন, এটাতো ভালো হল না!"

ইনি যবন! বিস্ময়ে আমি যেন অভিভূত হয়ে অবিনের দিকে চাইলেম। মনে একটু যে ঘৃণার উদয় না হয়েছিল তা নয়। অবিনটা তার পাতলা ঠোঁট খুব চেপে এবং বড়-বড় চোখে প্রকাণ্ড একটা কৌতুকের নিঃশব্দ হাসি নিয়ে আমার মুখে চেয়ে রইল। আমার তার উপর ভারি রাগ হচ্ছিল; সে যদি আগে বলতো তো যবনের পদধূলি—কথাটা মনে আসবামাত্রই সাধু একেবারে গলা ছেড়ে গেয়ে উঠলেন—

"কোই রহীম কোই রাম বখানৈ, কোই কহে আদেস,
নানা ভেষ বনায়ে সবৈ মিল ঢুঁর ফিরে চহু দেশ।"

আমার বেশটার উপরে এই ঠেস—সেটা যিনি কল্লেন তিনিও

যে ভেকধারী কেউ নন এটা তাঁর সাদা সিল্কের পাঞ্জাবীর উপরে কাশ্মীরী শাল এবং তার নীচে লুঙ্গী-ক্যাসানে পরা নূতন ধোয়া থান ধুতি দেখে কিছুতেই আমি ভাবতে পারলেম না। এমন সাধু আমি অনেক দেখেছি এবং সময়ে-সময়ে তাদের পাল্লায় পড়ে অনেক ঠেকেও শিখেছি। আমি একটু চেঁচিয়েই অবিনকে বল্লেম—"চল হে, জাহাজ আবার না ছেড়ে দেয়! সাধু দর্শন হল; চল এখন গঙ্গাস্নান করে বাড়ি যাই।"

অবিনের যিনি গুরু, তিনি এতক্ষণে এসে আমার হাত চেপে ধরে বল্লেন—"এই এতক্ষণে আপনি আমায় যথার্থ চিনেছেন। আসুন, একটু চা আর গোটা-দুই মুরগীর ডিম না খাইয়ে আপনাদের ছাড়া হচ্ছে না'।"

বলা বাহুল্য, যবনের পদধূলিতে ঘৃণা থাকলেও, যবনপালিত পক্ষীজাতির উপরে আমার কোনো আক্রোশ ছিল না। জেলের জল শাস্ত্র-মতে অগ্রাহ্য বলে জেলের মাছও যে বাদ দেব এমন মূর্খ আমি ছিলেম না; বা জেলখানার ছত্রিশ-জাতের গায়ের বাতাস মনুর মতে নিষিদ্ধ হলেও জেলের তেল অথবা সেই তেলে ভাজা সহরের ছত্রিশ-জাতের পদধূলি মাখানো গরম ফুলুরি যে অনাদরের সামগ্রী এটা স্বীকার করতে আমি একেবারেই নারাজ ছিলেম। তার পর সদ্য-ধোপ-দেওয়া সাদা চাদরে ঢাকা টেবিলে যখন অতি বিশুদ্ধ তামার কোষা কমণ্ডলু তাম্রকুণ্ডুতে টাট্‌কা-পাড়া মুরগীর সাদা ডিম এবং তার চেয়েও পরিষ্কার এবং সাদা পাঁউরুটি,

ঘরের গরুর দুধ, লিপ্‌টনের চা-পানি—কলের জলের, গঙ্গাজলের নয়—এসে উপস্থিত, তখন অবিনের গুরুকে সাধুবাদ দিতে একটুও আমার ইতস্তত করতে হল না।

ফকিরটির ভিতরে ফক্‌রেমি কোথাও ছিল না। দেখলেম তাঁর হাতের চিমটের তিনি তিনটে পাখীর খাঁচা ঝুলিয়েছেন এবং তাঁর গেরুয়া-বসনটা টুকরো-টুকরো করে কেটে তিনি বানিয়েছেন খাঁচার ঢাকা এবং পৈতের সুতোয় তিনি বানিয়েছেন ঘুড়ি ওড়াবার সরু লক্‌; লক্ষ্মীর ঘটটা উল্টে তিনি সরস্বতীর বীণার তুম্বি বানিয়ে নিয়েছেন। বৈরেগীদের যা-কিছু ভণ্ডামি, ও গোঁড়ামির যত-কিছু আসবাব, সবগুলোকে তিনি এমন-এক-একটা অদ্ভুত কাজে লাগিয়েছেন যে সেগুলোর দুর্দ্দশা দেখে দুঃখ না হয়ে, হাসি পাবেই পাবে। মনুসংহিতার, বাইবেলে, কোরাণে যেগুলো শুদ্ধ, সেগুলো বিরুদ্ধ-কাজে খাটিয়ে তিনি আপনার চারিদিকে এমন-একটা হাস্যরসের এবং অদ্ভুত রসের অবতারণা করে রেখেছেন যে মন সেখানে এসে দুঃসাহসে ভরে না উঠে যায় না। আমার মনে হল যেন বাইরের একটা পরিষ্কার বাতাস জোর করে আমার বুকের কপাটদুখানা খুলে দিয়ে গেল। এর পর যখন সেই সাধুপুরুষের দিকে চাইলেম তখন তাঁকে গুরু এবং বন্ধু এই দুই ছাড়া আমি আর-কিছু মনে করতে পারলুম না। আমি গুন্‌গুন্‌ করে গাইতে লাগলুম—"আরে ইন্‌ দুহু রাহ না পাঈ, হিঁন্দুকী হিংদ বাঈ দেখী, তুর্কনকী তুর্‌কাঈ।"

হঠাৎ হাতের কাছ থেকে বীণাটা তুলে নিয়ে বন্ধু আমার, গুরু আমার, তিনি গানের শেষ-চরণ দুটো পূর্ণ করে দিলেন—"কহৈঁ কবীর সুনো ভাই সাধো কৌন রাহ হবৈ যাঈ।" তার পর তাঁর সঙ্গে কবির লড়াই চলো ;—আমি গাই, তিনি জবাব দেন। কিন্তু আমার তেমন সুস্বরও ছিল না, আর বাজাতে তেমন দক্ষতা জন্মজন্মান্তরেও লাভ করব কি না তাও জানিনে।

সে-বেলায় ষ্টীমার অনেকক্ষণ ঘাট পেরিয়ে আপনার ঠিকানায় যাত্রী নিয়ে পৌছে গেছে—তখন তিনি বীণা রেখে বল্লেন—"চল এখন স্নান করে কিছু খাওয়া যাক্।" আমি গঙ্গার দিকে চাইতেই তিনি বল্লেন—"না, ওখানে নয়, আমার সঙ্গে এসো।"

এইটে তাঁর স্নানের ঘর। সাদা পাথরে মোড়া যেন একটা চাঁদের আলোর গহ্বরে এসে ঢুকলেম। মাঝে স্ফটিকের চেয়ে পরিষ্কার গোলাপ-জলের ফোয়ারা! কি বিপুল শুভ্রতার ঘাটে এই মহাপুরুষের সঙ্গে স্নানে নামলেম! যখন আমি এই কথা ভাবছি তখন একটা দাসী—তেমন সুন্দরী আমি কখনো দেখিনি—সোনার একটা পাখীর খাঁচা এনে বন্ধুর হাতে দিয়ে গেল। পাখীর পা-টা বাউলদের শতভালি কাঁথাখানার মতো নানা-রঙে বিচিত্র। পাখীটা খাঁচার তলায় বসে ধুঁকছে। আর তার রোগা পালক-ওঠা গলাটা থেকে গোপীযন্ত্রের শব্দের মতো গুব্ গুব্ একটা আওয়াজ বেরোচ্ছে। বন্ধু সেই মুমূর্ষু পাখীটিকে খাঁচা থেকে টেনে-হিঁচড়ে বার করে আচ্ছা-করে গোলাপজলের ফোয়ারায়

চুবিয়ে পাখীর হাতে একখানা সাদা রুমালের উপরে বসিয়ে দিলেন। পাখীর ডানা-দুখানা সেই সাদা রুমাল ঢেকে পাঁচমিশিলি বঙ রং-মাখানো বিশ্রী দুটো হাতের মতো ছড়িয়ে রইল। নির্জ্জীব পাখীটার হলদে দুটো চোয়াল বেয়ে লোহার কসের মতো পাতলা গেরুয়ারক্ত সেই রুমালখানার সাদা রং মলিন করে দিচ্ছে আর মূর্ত্তিমন্ত নিষ্ঠুরতার মতো আমাদের বন্ধু, দুটো জলন্ত চক্ষু নিয়ে সেই দিকে চেয়ে আছেন—এ দৃশ্যটা আমার কল্পনারও অতীত। আমার অন্তর-বাহির একটা বীভৎস বিস্ময়ে সেই লোকটার সঙ্গে আরো বেশী-করে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠবার উৎকট আকাঙ্ক্ষায় টলমল্ করে উঠল। এই দেখলেম এঁকে মহাপুরুষ, আবার এই দেখছি ঘোর নৃশংস—মৃত্যুর মতো নির্ম্মম। এ-রহস্যের ব্যূহভেদ একমাত্র অবিনই করতে পারবে জেনে আমি তার শরণাপন্ন হলেম। কিন্তু সে আজ অত্যন্ত নিষ্ঠুর হয়ে বল্লে—"আমি পারবো না ; ইচ্ছা হয় তুমি ওঁকে শুধোও।"

আমার আর ভোজনে সুখ হল না, শয়নে শান্তি এল না। মহাপুরুষ উপাদেয় রকমেই আমাদের পান ভোজন ও শয়নের ব্যবস্থা করেছিলেন। অবিনটা দিব্যি সেগুলো উপভোগ করে এবং বেলা চারটের সময় ফিরতি ষ্টীমার ধরবার জন্য ঠিক সময়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালো। কিন্তু আমার এস্থানটা থেকে কিছুতেই নড়তে ইচ্ছা ছিল না। এবার আমি অবিনের ঠিক পাল্টা-জবাব দিলেম—"আমি যাবো না ; তোমার ইচ্ছা হয় তুমি যাও।" কত

আশ্চর্য্য ব্যাপার চোখের উপরে ঘটে গেল, তাতে অবিনের কৌতূহল জাগেনি; কিন্তু ওই যে বলেছি যাবো না, অমনি তার মনে একটু 'কেন' জাগল এবং দেখতে-দেখতে সেটা একটা বিরাট কৌতূহলে পরিণত হল। সে ছড়িগাছটা আর ওভারকোটটা খুলে রেখে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে আমাকে শুধোলো—"নিমন্ত্রণ পেয়েছ নাকি?" আমি গম্ভীর হয়ে বল্লেম—"হুঁ।" অবিনের কৌতূহলের আবেগ দেখে হাসি পাচ্ছিল; সে একেবারে আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বল্লে—"এইখানে তুমি রাত কাটাবার নিমন্ত্রণ পেয়েছ? একি সম্ভব!"—"অসম্ভব কেমনইবা হবে?—" অবিন বোধ হয় আমার মুখ দেখে কতকটা এঁচে ছিল আমি তাকে ভোগাচ্ছি। সে এবার জোরের সঙ্গে বল্লে—"অসম্ভব; কেননা আমার পক্ষে সেটা আজ পর্য্যন্ত সম্ভব হয় নি!"—বলেই অবিন ওভারকোট পিঠে ফেলে উঠে দাঁড়িয়েছে, অমনি সেই মহাপুরুষ ঘরে এসে বল্লেন—"যা এতদিন অসম্ভব ছিল, আজ তা সম্ভব হোক; কি বলেন?"

আমাদের আর দুবার করে অনুরোধ করতে হল না। আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে যখন তাঁর দিকে চেয়ে দেখলেম তখন তাঁর হাতে হাতির দাঁতের রং একটা পাখী দেখ্‌লেম। সেটা পায়রা কি ঘুঘু কিছু বোঝা গেল না; আর তাঁর পাশে যেন পাথরে-গড়া একটি সুন্দর ছেলে।

আজ পূর্ণচন্দ্র আকাশের নীলের উপরে সাদা আলোর একটা

জাল বিস্তার করে দেখা দিয়েছেন। এমন পরিষ্কার ধব্‌ধবে রাত আমি দেখিনি। তার মাঝে একটা শ্বেত-পাথরের মন্দিরে আমরা এসে বসেছি। অবিনের পরণে তার সেই নেভি-ব্লু চায়নাকোট, আমার সেই গেরুয়া অলষ্টর, আর তাঁর পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত সাদা সাজ। তাঁর মাথার চুল যে এত সাদা তা পূর্ব্বে আমার চোখে পড়ে নি। যেন সাদা ফেনার মধ্যে তাঁর সুন্দর মুখ শ্বেত-পদ্মের মতো দেখা যাচ্ছে। আজ কি সাদার মধ্যেই এসে আমরা ডুব দিলুম। মেঘ যখন তার সমস্ত জল ছড়িয়ে দিয়ে হাল্কা হয়ে উঠেছে—এ তেমনি সাদা। হিমালয়পর্ব্বতের শিখরের তুষার যখন তার সমস্ত তরলতা সমাহার করে শুভ্র কঠিন হয়ে উঠেছে—এ তেমনি সাদা। এরি মাঝে তিনি আস্তে-আস্তে তাঁর ইতিহাস সুরু কল্লেন—"পূর্ব্বজন্মে যাগ-যজ্ঞ দানসাগর শ্রাদ্ধ ব্রাহ্মণ-ভোজন ও কুমারী দানে সর্ব্বস্ব লুটিয়ে দেবার পুণ্যে আমি তিন ত্রিশে নব্বই লক্ষ বৎসর বিষ্ণুলোক ব্রহ্মলোক আর শিবলোকে বাস করে শেষে অমরাবতীতে ইন্দ্রত্ব পদ দখল করে বসলেম। সে বারো হাজার বৎসর নন্দনবনে চিরযৌবন নিয়ে কি আনন্দ, কি বিলাসের মধ্যেই যে বাস কচ্ছিলেম তা বর্ণনাতীত। তোমরা এখানে মোগল-বাদসাহের বাবুগিরির যে-সব গল্প পড়ে অবাক হয়ে যাও সেখানকার তুলনায় সেগুলো কি তুচ্ছ! সেখানে বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই, শ্রান্তি নেই, অবসাদ নেই;—মনের বাগানে চিরবসন্তের ফুলগুলো সৌন্দর্য্যের সুখের লালসার মত্ততায় অনুরক্ত

পেয়ালার মতো রসে চিরদিন ভরপুর রয়েছে। অতৃপ্তির শিখা সেখানে আলাদিনের আশ্চর্য্য প্রদীপের মতো দিনরাত জ্বলছে। স্বর্গের সেই ক'টা দিন আমার ভোগের অনলে উর্ব্বশী রম্ভা তিলোত্তমাকে আহুতি দিয়ে প্রায় স্বর্গবাস শেষ করে এনেছি সেই সময়ে ইন্দ্রানীর উপরে আমার লোলুপ দৃষ্টি পড়ল। আমার কাছে অপ্রাপ্য তখন কিছুই ছিল না। আমার শেষ-পুণ্যফল একটা বিরাট অজগরের মতো উত্তপ্ত নিশ্বাসে আকর্ষণ করে শেষে একদিন ইন্দ্রের ইন্দ্রানীকে আমার দুই বাহুর মধ্যে এনে উপস্থিত কল্লে। সেই রাত্রি—সেই সুনীল আকাশের বাসর-ঘরে প্রমোদের বীণার ঝঙ্কারে নারীর ক্রন্দন, সতীর নিশ্বাসের করুণ সুর ডুবে গেল—অশ্রুত রইল! সেই আমার স্বর্গবাসের শেষ-প্রমোদ-রজনী, আমার চিরযৌবনের উত্তেজনার মদিরা পূর্ণমাত্রায় আমি পান কল্লেম। আর সেই রাত্রিপ্রভাতে ইন্দ্রদেবের অভিশাপের সঙ্গে-সঙ্গে বারো-হাজার বৎসরের শ্রান্তি আর অবসাদ প্রথম এসে আমাকে আক্রমণ করলে। ইন্দ্রের উদ্যত বজ্র থেকে আপনাকে রক্ষা করবার আর-কোনো উপায় ছিল না। আমি গিয়ে বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলেম। তিনি আমাকে একগাছা হরিনামের মালা দিয়ে বল্লেন—"তুমি নিজের কর্ম্মফলেই স্বর্গে এসেছিলে এবং তারি ফলে আবার পৃথিবীতে চলেছ; হরিনাম কর আবার এখানে তোমার স্থান হবে।" স্বর্গ যে কি ভয়ঙ্কর স্থান তা আমার জানতে বাকি ছিল না। অমর-অতৃপ্তিতে আমার আর লোভ ছিল না। আমি

বিষ্ণুকে নমস্কার করে ব্রহ্মার কাছে এলেম। তিনি তাঁর মানস-পুত্রদের লেখা খানকতক সংহিতা আমার হাতে দিয়ে বল্লেন "এতে যেমন বিধান লেখা হয়েছে সেই মতো যথাবিধানে পৃথিবীতে গিয়ে তুমি প্রায়শ্চিত্ত কর, স্বর্গ আবার তোমার করতলে আসবে।" আমি সেখান থেকেও হতাশ হয়ে দেবাদিদেবের দ্বারে উপস্থিত হয়ে তাঁকে সমস্ত নিবেদন কল্লেম। তিনি বল্লেন—"তুমি কারো কথা শুনো না, স্বর্গলাভের সহজ উপায় আমার হাতে আছে। এই এক টিপ সিদ্ধি মুখে ফেলে দাও, তোমাকে আর স্বর্গের ফটক পেরিয়ে বেশী দূর যেতে হবে না; আমার দূতেরা ঝুঁটি ধরে এখানে তোমায় ফিরিয়ে আনবে।" আমি তখন জগৎ-জননীর পা জড়িয়ে ধল্লেম। মা আমাকে কৃপা করে তিন রঙের তিনটি কপোত দেখিয়ে বল্লেন—"পৃথিবীতে এই তিন জন তোমার বন্ধু থাকবে, এদের চিনে নিও, তবেই জীবন তোমার শান্তিতে কাটবে, না হলে আবার এই স্বর্গবাস আর এই স্বর্গবাসের লাঞ্ছনা তোমার অদৃষ্টে ঘটবে নিশ্চয়।" আমি বিষ্ণুর জপমালা, ব্রহ্মার বেদশুসংহিতা আর শিবের সিদ্ধির পুঁটুলি টেনে ফেলে সেই কপোত-তিনটিকে বুকে জড়িয়ে ধল্লেম। একটি নীল, একটি গেরুয়া, একটি সাদা। দেখতে-দেখতে সপ্তস্বর্গ রামধনুকের রঙের মতো আমার চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে গেল। আমি এইখানে নেমে এলেম। সেই তিনটি কপোতী হচ্ছেন—"

অবিন অমনি ফস্-করে বলে উঠলো—"বস্ গুরুজী, আর না!

গল্পের ভিতর মোরালিটি ও নীতি-কথা এসে মিশছে, রক্ষে করুন! এই নীল-কোট-আমি—আপনার যৌবনের ইয়ার—আমিই হচ্ছি সেই নীল কপোত; মাঝে দুদণ্ডের মতো এই গেরুয়া-কপোত আমার বন্ধু—এ আপনার দাঁড়ে বসে ছোলা খেলে এবং আপনার গোলাপজলের ফোয়ারার পিচ্‌কিরিতে এর ভিতরের ও বাইরের বৈরাগ্য গেরুয়া-রক্ত বমন করে স্বর্গলাভও কল্লে; তবে এখন আপনার পাশে শিশু-বেশে যে সাদা কপোত দেখা দিয়েছেন ওঁকে নিয়েই আপনি শান্তিতে থাকুন, আমাদের আর নীতিকথা বলে দগ্ধাবেন না।"

শাণিত ছোরার উপরে আলো পড়লে যেমন হয়, মহাপুরুষের চোখদুটো অবিনের এই ধৃষ্টতায় ঝক্-ঝক্ করে জলে উঠ্‌ল। তিনি আস্তে-আস্তে দাঁড়িয়ে উঠে কোমর থেকে সাপের মতো বাঁকা একখানা ছোরা বার করে অবিনের দিকে এগিয়ে চল্লেন। আমি চীৎকার করে অবিনকে সাবধান করতে যাব কিন্তু কথা সরল না;—সেই ছেলেটা এসে আমার গলা এমন-ভাবে জড়িয়ে ধরেছে! সেই সাদা পাখীটা ঝটপট করে ডানা-ঝাপ্‌টে মাথার চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর অবিন তার দুই ঘুসো-বাগিয়ে সেই মহাপুরুষের দিকে এগিয়ে যেতে-যেতে কেবলি বলছে—"গল্পে নীতি-কথা অসহ্য!"—তার পর হঠাৎ একটা প্রচণ্ড আলো আর শব্দের মাঝে মহাপুরুষ অন্তর্ধান কল্লেন। আমি চম্‌কে উঠে ক্যাল্-ক্যাল্ করে চেয়ে দেখলেম জাহাজের ডেকে শুয়ে আছি; অবিন আমার

মুখে কেবলি জলের ঝাপ্‌টা দিচ্ছে; আমি যেন একটা স্বপ্ন থেকে জেগে উঠছি। মাথায় হাত দিয়ে দেখি একটা ভিজে পটি লাগানো। এই সময় আমাদের এক উকিল সহযাত্রী অবিনকে প্রশ্ন করলেন—"গাড়িটা যে মটোরের ধাক্কায় উল্টে গেল আপনি তার নম্বরটা নিলেন না কেন? এঁর মাথায় যে-রকম চোট লেগেছে তাতে নালিশ চলতো।"

টুপি

আমাদের এ-লাইনের দুখানা জাহাজের হঠাৎ স্বশরীরে বসোরা-লোক-প্রাপ্ত হবার কারণ যে চাটুয্যে বাঁড়ুয্যে কি মুখুয্যে মশায়দের পদধূলি নয়, সেটা নিশ্চয়। আজন্মত্রিসন্ধ্যা লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণের পদরেণু মেখে, গঙ্গাজলে নিয়ত ডুবে থেকে, ও গঙ্গার বাতাস সেবা করেও জাহাজ-দুখানা যায় তাদের পুরানো তক্তার ঘুণ, বেঞ্চিগুলোর ছারপোকা-সুদ্ধ গোলোকে না গিয়ে কেন বরাবর বসোরার গোলাপবাগে হাজির হয়, এর সঙ্গে অবিনের বুকের মাঝে বারোমেসে গোলাপফুলের খসে-পড়া পাপড়িগুলোর কোমল স্পর্শের কোনো যোগাযোগ আছে কিনা সেটা আবিষ্কার করতে আমি যখন খুবই ব্যস্ত, সেই সময় একদিন বিকেল সাড়ে-পাঁচটার ষ্টীমারে পাশের বেঞ্চে একটু জায়গা কোনোরকমে দখল করে চলেছি—

একটু হাওয়া খেয়ে আসবার আশায় ; কিন্তু দুরদৃষ্ট—এক জাহাজ বটে কিন্তু তাতে লোক উঠেছেন প্রায় তিন জাহাজ ! তার উপর খালাসী আছেন, সারেং আছেন, সাহেব আছেন, সাহেবের বেতে-ছাওয়া চৌকি আছেন, আর আছেন সমস্ত পুলিশ কোর্টটি ! ন স্থানং তিল ধারয়েৎ !—এর উপরেও বোঝার উপর শাকের আঁটির মতো কোনো গৃহিণীর ফরমাস-দেওয়া আফিসের ফেরতা মার্কেটের ফুলকপি, শনির তাগাদা-মতো সা ও লা কোম্পানির গ্রীণ্ সিল্ ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় সব অনবরত এসে পড়তে বিলম্ব করছিল না ! এই সময় অবিনকে আহিরিটোলার ঘাটে তার বাঁয়া-তবলা গোবিন্দ চাকর আর আলবোলা নিয়ে লাল কাপড়ে বাঁধা বিশ্ব-সঙ্গীতের মোটা পুঁথি-বগলে জাহাজ ধরতে দেখে মন আমার 'হা হতোস্মি' বলে মূর্চ্ছিত হয়ে যে পড়ে এমন-একটু স্থান পেলে না ;—দাবাবোড়ের আটঘাট-বাঁধা রাজার মতো বেচারা কিস্তিমাতের অপেক্ষা করেই রইল।

বোঝাই কিস্তি আমাদের ঘাট ছেড়ে গঙ্গার মাঝ দিয়ে উত্তরমুখে আস্তে-আস্তে চলেছে। আশপাশের মানুষের মাথাগুলো এত কাছে এবং এত বড় করে দেখতে পাচ্ছি যে দূরের জিনিষ—তীরের ও নীরের কিছু আজ আর চোখেই পড়ছে না। এই মাথামুণ্ডুর উপরে কেবল দেখছি প্রকাণ্ড খোট্টাই টুপির মতো আধখানা সূর্য্য,—যেন লাল স্যাটিন কেটে দর্জ্জি সেটা এইমাত্র বানিয়ে সব মাথাগুলোতে ফিট্ করে নিতে চাচ্ছে ! টুপির রহস্যে মনটা

আমার যখন বেশ মগ্ন হয়েছে সেই সময় ভিড়ের মধ্যে থেকে অবিন আমায় ডাক্‌লে—"ওহে এদিকে এসো!" সঙ্গে-সঙ্গে অবিনের হাত এসে ছোঁ-মেরে আমাকে একেবারে ফার্ষ্ট ক্লাসের প্রথম বেঞ্চি থেকে লাষ্ট ক্লাসের শেষ বেঞ্চিতে এনে উপস্থিত কল্লে।

চামড়ার ষ্ট্র্যাপে বাঁধা হোল্ড-অল্ থেকে চটকানো কাপড়ের সুটটার মতো মানুষের ঐ চাপন থেকে অবিন যখন আমাকে টেনে এনে বাইরে ফেল্লে তখন কি যে সোয়াস্তি পেলুম! আঃ জাহাজের এই অংশটা ফার্ষ্ট ক্লাস থেকে বরাবর গড়িয়ে এসে, একেবারে গঙ্গার জল আর দক্ষিণের হাওয়ার মধ্যে ডুব দিয়েছে। এখানে ভদ্রয়ানার চাপ এক-আনাও নেই;—খোলা বুক, খালি পা নিয়ে এখানে কাজ থেকে খালাস-পাওয়া যত খালাসী সূর্য্যাস্তের আলোর মধ্যে নিজেদের মজলিস্ সারিগানের সুরে জমিয়ে তুলেছে।

সে একটি ছোকরা,—হয় তো ঠিক ছোকরা বলতে যতটা বোঝায় বয়সটা তার চেয়ে বেশী হলেও হতে পারে—কিন্তু মুখ-চোখ তার এখনো কাঁচা। জগতের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় শেষ করে দিয়ে বিজ্ঞ হয়ে বসবার এখনো তার দেরী আছে সেটা বুঝলুম; এবং তার মুখে এই গানটা আমার ভারি অদ্ভুত ঠেকল—

উত্তর দিকে অ্যালো বঁধু ভাঙা নায়ের গুন টানা,
আমার বঁধু দাঁড়িয়ে আছে পুন্নিমের ওই চাঁদখানা!
বঁধু মুখের মধুর হাসি, দেখলে নয়ানজলে ভাসি,
বঁধুর কথা রসে ভরা ঠিক যেন চিনির পানা!

কলাই-করা ডেকচির বাঁয়া-তবলার তালে-তালে মাথা দোলাতে-দোলাতে—ওই বঁধু, চাঁদ, চিনির পানা, নয়ান জল এবং উত্তর থেকে গুন টেনে ভগ্ন তরীর আসার মধ্যে সারবস্তু কিছু উদ্ধার করবার চেষ্টা করছি এমন সময় হঠাৎ একটা দম্‌কা হাওয়ায় অবিনের মাথার কালো টুপিটা উড়ে ডেকের উপর দিয়ে গড়াতে-গড়াতে বেঞ্চির তলা হয়ে জাহাজ টোপ্‌কে একেবারে জলে ঝাঁপিয়ে পড়বার জোগাড় করলে। অবিন তাকে মাথায় চড়ালেও টুপিটা ছিল নিতান্ত আমারি, সুতরাং আমি যখন তাকে অপমৃত্যু থেকে বাঁচাবার জন্যে এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করছি সেই সময় পিছনে হোঃ হোঃ হাসির রব শুনে ফিরে দেখলেম সেই খালাসী ছোকরা তার সব ক'পাটি দাঁত বের করে হাস্‌ছে আর হাততালি দিচ্ছে—আমারি দিকে চেয়ে। আমার তখন রাগ করবার মোটেই অবসর ছিল না। নগদ সাড়ে-সাত টাকা মূল্যের হোসেন-বক্সের দোকানের নতুন টুপিটা জলে যাওয়া থেকে কোনো-রকমে বাঁচিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে অবিনের পাশে এসে বসেছি সেই সময় সেই ছোক্‌রা খালাসী আমাকে এসে সেলাম করে বল্লে—"হুজুর, বেয়াদবি মাপ করবেন! মাথা থেকে টুপি খসে পড়লে আমি বড় খুসি হই। ওটা জলে গেলে আমি আরো খুসি হতুম। টুপি নিয়ে আমি অনেক ভোগ ভুগেছি। ছেলেবেলায় আমার বাপ আমাকে কখনো টুপি পরতে দেননি। তিনি বলতেন—লণ্ঠনের উপর গেলাপ্‌ ঢাকা দিলেও যা, মানুষের মাথায় টুপি চাপালেও

তা,—আলো পাওয়া শক্ত হয়। টোপকে মাছ যেমন এড়িয়ে চলে, ছেলেবেলা থেকে—কি দেশী, কি বিদেশী—সব টোপিকে তেমনি ভয় করে কেবলমাত্র খোদার-দেওয়া টুপিটা নিয়ে আমি বড় হতে লাগলুম। সেই সময়ে আমার বাপ একদিন যে-কালো-টোপি মাথায় পৃথিবীতে এসেছিলেন তার কালো রং খোয়া কাপড়ের মতো, এই গঙ্গাজলের ফেনার মতো, পুন্নিমার ওই চাঁদের জোছনার মতো সাদা করে নিয়ে খোদাতালার দরবারে হাজরি দিতে চলে গেলেন।

মা তো ছিলেন না, বাপও গেলেন—এক ছেলে আমাকে অগাধ বিষয়ের মালিক রেখে! কিন্তু বেশীদিন আমাকে অনাথ থাকতে হল না। অনেক জুটলো, এ গরীবের মা-বাপ হয়ে বসবার লোক অনেক জুটলো;—এত জুটলো যে তাদের ভিড়ে আমার সদর ও অন্দর ভর্ত্তি হয়ে শেষে আমার মালখানা তোসাখানা আস্তাবল পর্য্যন্ত সরগরম গুলজার হতেও বাকি রইল না। আমার মাথা খালি দেখে বাপও কোনোদিন সেটাকে টুপি ঢাকা দিতে ব্যস্ত হন্‌নি এবং মাও কখনো দুঃখ পান্‌নি; কিন্তু এরা আমার মাথায় টুপি না দেখে একেবারে নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে আমার খালি মাথার পর্দ্দা রাখবার জন্যে উঠে-পড়ে লেগে গেল এবং মৌলবীসাহেবরা যতদিন না বিচ্‌মিল্লা বলে জাঁকালো একটা খুঁব উঁচু টুপি আমার মাথায় চাপিয়ে দিয়ে গেলেন ততদিন এরা কিছুতেই ঠাণ্ডা হল না! টুপিটা বাইরে খুব জম্‌কালো—জরী

জরাবতের কাজ, আর ভিতরটায় গাধার চামড়ার গদী লাগানো! তারা এমন চমৎকার করে সে টুপিটা বানিয়েছিল যে টুপি-পরা কোনোদিন অভ্যাস না থাকলেও সেটা পরতে আমার কোনো কষ্টই হল না।

নতুন গোঁফ উঠতে আরম্ভ হলে যেমন সময়ে-অসময়ে সেটাতে তা না দিয়ে থাকা যায় না—তেমনি এই টুপিটাকে যখন-তখন মাথায় দিয়ে আমি বেড়াই। টুপির গুণে আমার মুখ দেখতে-দেখতে বুড়োদের মত গম্ভীর, আমার কথাবার্ত্তা চালচলন খুব পাকা আর মাথার সামনের চুল উঠে গিয়ে কপালটা আমার খুবই চক্‌চকে ও চওড়া হয়ে উঠলো। ঐ টুপিটা দেখলেই রাস্তার লোকেরা আমাকে খুব বুদ্ধিমন্ত শ্রীমন্ত এবং আরো কত-কি বলে দুহাতে সেলাম ঠুকতে লাগলো আর তাদের মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ের ঘটকালি নিয়ে দুবেলা মহল-ভরা আমার মা-বাপেদের পায়ে তেল দেবার জন্যে হাজির হতে লাগল।

এতগুলো মাথা একত্র হয়ে আমার বিয়েটা কি-রকম সর্ব্বগ্রাসী ধুমধামের সঙ্গে যে দিয়েছিল তা তো বুঝতেই পাচ্ছেন! এতগুলো শ্বশুর-শাশুড়ির মন যুগিয়ে চলতে আমার স্ত্রীর সে কি যমযন্ত্রণা! বিয়ের হিসেবের খাতা চুকতে না চুকতে বেচারা প্রাণত্যাগ করলে আর সাতরাজার ধনে ধনী আমাকে মাথার টুপি ভিক্ষের ঝুলির মতো করে বোগদাদের রাস্তায়-রাস্তায়—মাদ্রাসা থেকে মাদ্রাসায় উমেদারি করে ফিরতে হল। টুপিকে আমার কেউ অনাদর

কল্লে না বটে কিন্তু টুপি যার মাথায় বাসা বেঁধেছিল সেই টাকার মতো একটি গোল টাক-ওয়ালা মানুষটিকে দেখলেম কেউ খাতিরেও আনতে চাইলে না—সেই দুঃখের দিনে।

কতকাল টুপি-পরার এই ফল—অনেক তদবিরের এই টাক—এ'কে আবার সেই টুপিতে ঢেকে বোগদাদ ছেড়ে আমি বসোরার দিকে রওনা হলুম। যদি কেউ না জোটে তবে টুপির একটা দোকান খুলে দেশসুদ্ধকে টুপি পরিয়ে তবে ছাড়বো! অবিশ্যি এ বুদ্ধিটা বোগদাদে থাকতে-থাকতে আমার মাথায় যোগালে হোতো ভালো, কিন্তু কে জানে, ঐ টুপির গুণে কিম্বা যে লম্বাকান জানোয়ারের চামড়া দিয়ে সেটা আস্তর করা ছিল তারি গুণে, বুদ্ধিটা যখন আমার মাথায় এল তখন বোগদাদ থেকে অনেক দূরে—বসোরায় এসে পৌঁচেছি। এখানে কেউ টুপি মাথায় দেয় না! গোলাপফুলের পাপড়ির গোড়ে-মালা গেঁথে তারা পাগড়ির মতো কিংবা আপনাদের ঐ শিবঠাকুরের সাপের মতো কেবল মাথায় জড়িয়ে রাখে। বোগদাদে আমার মতো সুপুরুষ কমই ছিল; এখানে দেখলেম আমার মতো সুপুরুষকে কেউ বিয়েই করতে রাজি হয় না। তার উপর মাথার মাঝে ছিল সেই টাকা-প্রমাণ টাকটি! যেখানে কেউ টুপি পরে না, সেখানে সর্ব্বদা টুপি দিয়ে টাক ঢেকে যে কি আতঙ্কে আর আসোয়াস্তিতে দিন কাটাতে লাগলেম তা কেমন করে জানাব। আমার কেবলি মনে হতো বসোরার এই গোলাপফুলের খোসবোক্তে

ভরা জোর-বাতাসে যেদিন আমার এ-টুপিটা উড়ে যাবে, সেদিন শাখার রেঁায়ার আস্তরের আওতায় টাক-পড়া মাথাটা আমি কোন্‌খানে গিয়ে লুকোবো! বসোরায় যেমন গোলাপফুল তেমনি গোলাপী ঠোঁটের মধুর হাসিও অনেক,—সেই হাসির তুফানের ঝাপটা থেকে টাক বাঁচাতে আমাকে কি ভোগই না ভুগ্‌তে হচ্ছিল। টুপিটা আমার মাথার কুরুনি পোকার মতো ;—তাকে টেনে ফেলতে পারা শক্ত, তাকে রাখ্‌লেও যন্ত্রণার অন্ত নেই।

এই সময় যন্ত্রণার উপর যন্ত্রণা,—আমি প্রেমে পড়লেম! আসকের আগুন যদি মগজে জ্বলতো তবে সেটাকে টুপি চাপা দিয়ে সহজেই নেবাতে পারতেম কিন্তু সে যে খোদার নিজের হাতে জ্বালা বাতি, টুপি দিয়ে তাকে নেবানো চলে এমন জায়গায় তিনি তাকে রাখেননি। দুনিয়াকে রোসনাই দিতে সে-বাতি তিনি জ্বালিয়েছেন—বুকের মাঝখানে প্রাণের সঙ্গে এক শামাদানে। সেই বাতির আলোয় যাকে আমি ভালোবাসলেম তাকে কি সুন্দরই দেখলেম! যদিও সে বসোরার গোলাপবাগের খুব ছোট ফুল বৈ বড় ফুল ছিল না। সেই দিন আমি সবপ্রথম খোদা-তালার কাছে হাত-পেতে ভিক্ষে চাইলুম—আমার ছেলেবেলাকার সেই কোঁকড়াচুল খালি মাথা! হাসবেন না বাবু, সবাই চায় খোদার কাছে বড় হতে, আমি বল্লেম—'আমায় ছোট কর'। দুনিয়া ছিষ্টি হয়ে এমন ভিক্ষে শুধু কি আমিই চেয়েছি? কত লোক চেয়েছে, পেয়েছে, এখনো চাচ্ছে দেখুন না—"

আমি সেই ছোকরার কথায় নদীর পশ্চিম-দিকে চেয়ে দেখলেম পৃথিবীর মাথার উপর থেকে সেই লাল মখ্‌মলের বড় টুপিটা সরে গেছে, দিগন্তের শিয়রে কালো মেঘ এসে লেগেছে, আর নদীর পূবপারে চাঁদনী রাতের নতুন জ্যোৎস্না, তারি তলায় গাছের আড়ালে একটি মন্দিরের ঘাটে বাঁশীতে সাহানার সুর বাজছে।

সেই নতুন রাতের মধ্যে দিয়ে আস্তে-আস্তে জাহাজ এসে বড়-বাজারের ঘাটে লাগল। আমি অভ্যেস-মতো অবিনের কাছ থেকে আমার টুপিটা চাইতেই সে অবাক হয়ে বল্লে,—"সে কি! তোমার পাশেইতো সেটা ছিল!"

জাহাজ থেকে অনেকগুলো টুপিওয়ালা নেমে গেল, কেবল আমরা দুই বন্ধুতে নামালেম খালি মাথা। তার পর দিন সে-জাহাজখানাও বসোরায় চলে গেল। গল্পের শেষটা শোনবার ইচ্ছা থাকলেও সে-ছোকরার আর দেখা পেলুম না।

———

দোশালা

শালখানা দেখতে সচরাচর যেমন হয় ;—একখানা জরদ্-কালো-সবুজ-আর-লাল রঙের চারবাগ। কিন্তু সেখানি পোরে ষ্টীমারের ফার্ষ্ট-ক্লাসের বেঞ্চিতে এসে যে বসলো তার চেহারাটা মোটেই সেই কাশ্মীরী শালের উপযুক্ত ছিল না ;—খোঁচা-খোঁচা দাড়ি-গোঁফ, মাথাটা কিটকিটে ময়লা পাগড়িতে ঢাকা, গালের হাড়দুটো উঁচু আর তারি কোটরে শুক্‌নো আঙুরের রং দুটো বিশ্রী চোখ ! অবিনের দস্তুর, নতুন লোক দেখলে সে তার দিকে খানিক কট্‌মট্ করে না-তাকিয়ে থাকতে পারে না। সেদিনও বেঞ্চিখানার সামনে দাঁড়িয়ে মিনট-পাঁচেক সেই লোকটাকে আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করে নিয়ে তবে অবিন আস্তে-আস্তে আমার পাশে এসে বসলো। তার পর এ-ঘাট ও-ঘাট সে-ঘাটে ভিড়তে-ভিড়তে জাহাজ লোকে-লোকে ভর্ত্তি হতে-হতে যখন আমাদের ঘাটে এসে পৌঁছল, সেই সময় ভিড়ের মধ্যে থেকে এক ভদ্রলোক অবিনকে বলে উঠলেন—"আপনার শালখানা এখনি হাওয়ায় উড়ে গঙ্গায় পড়বে, ওখানাকে একটু সাবধানে রাখুন।" আমরা দুজনে অবাক হয়ে চেয়ে দেখলুম সেই চার-রঙা চারবাগ শালের রুমালটা জাহাজের রেলিং থেকে ঝুল্‌ছে, সে মানুষ নেই !

শালখানা যার, সে নিশ্চয় গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেনি। সুতরাং আমরা দুই বন্ধুতে নিশ্চিন্ত মনে হাত-ধরাধরি

করে আহিরিটোলার ঘাটে নেমে গাড়িতে উঠেছি এমন সময় এক ছোকরা খালাসী—"বাবু শাল আপনার।" বলেই তাড়াতাড়ি গাড়ির জানলা গলিয়ে সেই শালখানা অবিনের কোলের উপর ফেলে দিয়ে চট্ করে ভিড়ের মধ্যে মিশিয়ে গেল। আমি গাড়ি থামিয়ে সেই খালাসীকে ডাকতে যাই, অবিন বল্লে—"থাক্‌না, কাল ফিরিয়ে দিলেই চলবে।" বন্ধুবান্ধবের টুপি ইত্যাদির মতো টুকিটাকি জিনিষ হলে আমার আপত্তি ছিল না; কেননা সেগুলো অবিন প্রায়ই ধার নেয় এবং আজ বাদে কাল, নয়তো পরশু, সুদসুদ্ধ সেগুলো ফিরিয়ে দিতে কিছুমাত্র দেরি করে না; কিন্তু এই শালখানা যার, সে নিশ্চয়ই অবিনকে সেখান্না বখশিস কিম্বা একরাত্রের মতো ভাড়া দেবার মতলবে ষ্টীমার পর্য্যন্ত তাড়া-করে আসেনি, সেটা ঠিক; এবং সে যে পুলিশে খবর না দিয়ে চুপ করে বসে থাকবে সেটাও সম্ভব নয়; কাজেই পোর্ট-কমিশনারের হারানো-মালের অফিস-ঘরের দিকেই গাড়িটা চালাতে আমি অবিনকে বিশেষ করে অনুরোধ কল্লেম; কিন্তু সব বৃথা! বাঘের থাবা শিকারের উপরে যেমন, তেমনি অবিনের মুঠো সেই শালখানার একটা কোণ সেই যে চেপে রইল, আহিরিটোলার বাড়ীতে পৌঁছান পর্য্যন্ত সে-মুঠো আর কিছুতে শিথিল হল না। তারপর ঘরে ঢুকে অবিন যখন সেই শালখানা মেঝের উপরে বিছিয়ে দিলে তখন দেখলেম, কি আশ্চর্য্য সোনা-রূপো-রেশমের তার দিয়েই সেটা বোনো। ষ্টীমারে শালখানার সবটা

আমার চোখে পড়েনি, এখন বাতির আলোতে যেন একখানা নন্দন-কানন আমাদের চোখের সম্মুখে এসে উদয় হল। এরি উল্টো পিঠে দেখলেম বোনা রয়েছে—বীণা-হাতে এক কালো-কুৎসিৎ ঝাঁকড়া-চুল ডাইনি-বুড়ি।. পরের জিনিষকে ঠিক লোষ্ট্র ভেবে নিয়ে সেটার উপরে সম্পূর্ণ নির্লোভ হয়ে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব কিনা সেটা পরখ করবার কারণ কোনোদিন আমার কাছে উপস্থিত হয়নি কিন্তু কারিগরের হাতের অপূর্ব্ব সৃষ্টিগুলোর উপরে আমার যে প্রাণের টান, সেটা যে অবিনের হাত থেকে এই অমূল্য শালখানা ছিনিয়ে নিয়ে পালাতে না-চাচ্ছিল তা নয়।

কিন্তু অবিনকে আমি চিনতেম, কাজেই শালখানা তাকে খুব সাবধানে রাখতে আর পুলিশ-হাঙ্গামার পূর্ব্বেই যদি সম্ভব হয় সেটাকে যথাস্থানে ফিরিয়ে দিতে বিশেষ করে বলে আমি বাড়ী এলেম। তার পর দুদিন আমি জাহাজে যাওয়া কামাই দিলেম। না যাওয়ার কারণ নানা; তার মধ্যে প্রধান কারণ লালপাগড়ি আর ষ্টীমারের উপরে সেই শাল-হাতে অবিনের একটা অবর্ণনীয় রূপ কল্পনা।

তৃতীয় দিনের সকালে সাতটা-দশের-ষ্টীমার আমাকে একলা নিয়ে বড়বাজার ছেড়ে আহিরিটোলার দিকে চলেছে। সকালের রোদে ভাটার জল আর জলের ধারে অনেক দূর পর্য্যন্ত ভিজা কাদা মাজা-কাঁসার মতো ঝক্‌ঝক্ কচ্ছে। তারি উপরে অনেকগুলো মানুষ কালো-কালো আবলুস্ কাঠের পুতুলের

মতো দেখছি। ঘাটের ধারে পাঁচিলে-ঘেরা শ্মশানের মধ্যে থেকে খানিকটা সাদা ধোঁয়া আস্তে-আস্তে আকাশের দিকে উঠছে। এরি উপরে দেখতে পাচ্ছি লাল-সাদা-ডোরা-টানা তেতালা একটা বাড়ীর চিলের ছাদে মাটির এক মহাদেব পিতলের ত্রিশূল উচিয়ে দাঁড়িয়ে; আর ঠিক তারি পিছনে আলোর গায়ে একটি মস্‌জিদের তিনটে গম্বুজ—অপরাজিতা ফুলের মত নীলবর্ণ।

আহিরিটোলার ঘাটের যে-কোণটিতে রোজ অবিন দাঁড়িয়ে থাকে, সেই কোণটায়, দূর থেকে তার বিশাল বুকের মাঝে চির-বসন্তের সিগ্‌নেলের আলোর মতো বড় লাল-গোলাপ-ফুলটার সন্ধানে আমার চোখ আজ দৌড়ে গিয়ে দেখছে অবিনের জায়গায় একটা রবাব কাঁধে একজন পেশোয়ারী—কালো লুঙ্গি, ঢিলে কোর্ত্তা, বড় পাগড়ি, কটা দাড়ি, কোঁকড়ানো চুল নিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে আছে।

একটা বয়া প্রদক্ষিণ করে ষ্টীমার উত্তর থেকে দক্ষিণ মুখে ঘুরে তবে আজ আহিরিটোলার ঘাটে ভিড়লো। অবিনকে না দেখে সেদিনের সেই শালখানাই যে তার এদিনের ছুটি এবং কামাই দুয়েরই কারণ এবং পুলিশ-কোর্টেই যে তাকে আটটার মধ্যে থেয়ে হাজরি দিতে হচ্ছে ওটা আমি একরকম স্থির করেই নিয়ে চুরুটটা ধরিয়ে একলা কবীরের পুঁথির সঙ্গে দু-ঘণ্টা কাটাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে বসলুম। ঘাট ছেড়ে জাহাজ আর-একবার একটা গাধাবোটের রগ ঘেঁসে পাট-বোঝাই এক-

খানা কিস্তিকে সজোরে ধাক্কা মেরে বাগবাজারের লোহার পোল ডাইনে রেখে সোজা কাশিপুরের দিকে চল্লো।

খড়-বোঝাই হোলাগুলো আদিম যুগের লোমশ কতকগুলো উভচর জন্তুর মতো ডাঙার খুব কাছাকাছি কাদা-জলে নিজেদের অনেকখানি ডুবিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ডাঙার উপরে মালগাড়ির সার যেন আর-একটা শক্ত খোলায় মোড়া বিকটাকার শুটিপোকার মতো আস্তে-আস্তে চলেছে। দূর থেকে কাশিপুরের জেটিটা দেখতে পাচ্ছি। সেখানে অবিন দাঁড়িয়ে—জলের নীলের উপরে, সোজা বিশাল স্থির নিবাত নিষ্কম্পমিব। তার কাঁধ থেকে সেই শালখানা নানারঙের ফুলের একটা মস্ত গোছার মতো ঝুলে পড়েছে—সুন্দর ভঙ্গীতে। আমি গুন্‌গুন্ করে সুরু করেছি—

"হুয়া জব ইস্ক মস্তানা কহিঁ সব লোগ দিওয়ানা।"

রবাবটায় একটা মস্ত ঝঙ্কার দিয়ে পিছন থেকে সেই পেশোয়ারীটা হঠাৎ আমার পাশে এসে বস্‌লো—

"জিসে লাগি সোঈ জানা
কহেসে দর্দ ক্যা মানা॥"

পণ্টুন থেকে অবিন চেঁচিয়ে বলে উঠলো—"আগা-সাহেব, কাবুলী গীত ফরমাইয়ে, নেহিতো দোশালা ছোড়েগা নেহি।" এর পরেই জাহাজ ঘাটে ভিড়তেই অবিন ঝুপ করে সেই শালখানা আমায় ছুঁড়ে দিয়ে ষ্টীমারে উঠে এল। আগা-সাহেব তাকে একটা

বন্ধ সেলাম-বাজি করে রবাবের সঙ্গে একটা কাবুলী গান আরম্ভ করলে—

সুমিওলী পমজল সুমিওলী
পদম্কেনা পমজল সুমিওলী-ঈ-ঈ—

সুরও যেমন, কথাও তেমনি বিদ্ঘুটে! পমজল পমজল যেন মশার ঝাঁকের মতো কানের কাছে কেবলি ভন্ভন্ করছে আর মাঝে-মাঝে সুমিওলী সে-গুলোকে ফুঁ-দিয়ে উড়িয়ে দিচ্ছে। আশ্চর্য্য এই যে অবিন বেশ মশ্গুল হয়ে এই ভন্ভনানির মাঝে সুখে বসে রয়েছে। কানে কম্ফরটার এবং তার উপর সাতপুরু চাদর জড়িয়ে একটি রোগা ছেলে—এর কম্ফরটার ছাড়াবার জন্যে আমি তাকে রোজ ধমকাতে ছাড়িনে কিন্তু আজ তাকে দিব্য হাস্যমুখে সামনের বেঞ্চে বসে থাকতে দেখে আমার কি হিংসেই না হচ্ছিল! শ্রবণের দরজায় আগল টেনে ছোকরা আজ কি সুখেই আছে—সুর-বেসুর সবার থেকে দূরে! নিবিড় নীরবতার অন্দরে আপনাকে ডুবিয়ে রাখবার আমার প্রার্থনাটা বোধ হয় বিনা-তারের টেলিগ্রাফের মতো মা-গঙ্গার কাছে পৌঁছে থাকবে, তাই রবাবের সুরটা বাজির ঘাটে পৌঁছবার কিছু আগেই একটা তার-কাটার শব্দের সঙ্গে-সঙ্গে বন্ধ হল—কাবুলী গানের মাথায় যেন বজ্রাঘাত করে। অমনি হন্ করে একটা হাওয়ায় চারিদিক থেকে শোনা গেল—বন্! অবিন একটা মিলিটারিরকম সেলাম দিয়ে আগা-সাহেবকে বল্লে—"আগা তো টুটা; অব্?" "অব্ শুনিয়ে"—বলেই আগা-সাহেব আরম্ভ

কত্তোন পোস্ত উর্দু আর হিন্দি ভাষায় খিচুড়ি ;—একটা আজগুবি গাঁজাখুরি গল্প—সেই শালখানার আদ্যন্ত কাহিনী। গল্পটা খুব গুরুপাক করেই আগা-সাহেব আমাদের উপহার দিলেন—ভাষায় পেঁয়াজ রসুন আর হিং তিনেরই বুকনি দিয়ে। কিন্তু দুঃখের বিষয় অবিন গল্পটার খুব তারিফ করলেও আমি সেটা থেকে বড়-কিছু রস গ্রহণ করতে পারলেম না। মাথা তখনো আমার কাবুলীর সেই বেসুরো গান আর রবাবের ঝম্‌ঝমানিতে বিগড়ে ছিল ; সুতরাং গল্পের সঙ্গে গল্পকর্ত্তাকেও জাহান্নামে পাঠাতে আমি কিছু-মাত্র ইতস্ততঃ কল্লেম না ;—কিন্তু মনে মনে! কারণ কাবুলী-মাত্রেরই যেটা চিরসহচর মোটা সেই লাঠি, তার সামনে মুখ-ফুটে কিছু বলা একেবারেই আমার মতবিরুদ্ধ।

সকালের গঙ্গার পরিস্কার পটখানির উপর হিজিবিজির মতো এই লোকটার গল্প আর গান! সেটা শেষ করে সে যখন কটা দাড়ির আড়াল থেকে বত্রিশপাটি দাঁত বের করে বল্লে—"বাবু, শাল দেও, অব্ হাম চলে।"—তখন অবিন খুসির সঙ্গে তাকে সত্যিই সে শালখানা দিয়ে দেয় দেখে আমি আর রাগ সামলাতে পারলুম না। ঝাঁ করে অবিনের হাত থেকে শালখানা টেনে নিয়ে বল্লেম—"তুমি কেমন হে! কার শাল তুমি কাকে দাও? কোথাকার একটা জোচ্চোর মিথ্যে বকর্-বকর্ করে ফাঁকি দিয়ে এই দামী শালটা নিয়ে যাবে, এ হতেই পারে না।"

অবিন আমার ব্যবহার দেখে একটু থতমত খেয়ে গেল।

কাবুলীটা হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠল—"ক্যা বাবু, হাম জুয়াচোর হ্যায়।" আমার রাগ তখন সপ্তমে, সুতরাং গলাটাও সেই সুরে বল্লে—"যেন কাবুলের আমীর রে! যাঃ যাঃ আর শাল পরতে হবে না! এটা আমার শাল হ্যায়, জানতা এখনি তোম্‌কো পুলিশকা হাতে জিম্মে করে দেগা!" রাগের মাথায় বিত্তাসাগরী বাংলা একেবারে হারিয়ে ফেলে গড়গড় করে চলতি বাংলাতে আমি তাকে যাচ্ছেতাই বলে গেলুম। কে জানে, চলতি ভাষার এক্‌সেন্টের জোরেই হোক বা বালির ঘাটে লালপাগড়ীর জীবন্ত একসেন্টাকে দেখেই হোক, কাবুলীটা তার গেলাপ-মোড়া রবাবটাকে কাঁধে তুলে চোঁ-চোঁ চম্পট দিলে—সোজা পন্টুন বেয়ে জেলুয়ার মুখে। আমি তখন খুব গম্ভীর হয়ে শালটা নিজের কাঁধে ফেলে আপনার জায়গায় স্থির হয়ে বসলুম। গঙ্গার বাতাসে রাগ ঠাণ্ডা হতে আমার বেশীক্ষণ লাগলো না। অবিন দেখলেম তুইচোখ নিমীলিত করে সম্পূর্ণ ধ্যানস্থ। গাল খেয়ে কাবুলীটা আমায় যদি খুনও করে যেতো তবু তার চোখ খুলতো কি না সন্দেহ। এমনি খুব চেপে দুইচোখ বন্ধ করে সে পৃথিবীর গণ্ডগোল থেকে আপনাকে বাঁচিয়ে চলেছে সেটা আমি বেশ জানি এবং সে এই চোখ যখন খুলবে তখন যে ধমকের অগ্নিবাণটা আমার উপরেই প্রথম পড়বে তাও আমি জানতেম। আমি আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করে শালখানি আস্তে-আস্তে তার পাশে রেখে পাশ-কাটিয়ে একটু দূরে বসলেম—যেন প্রথম চোখ খুলেই শালখানাকে অবিন দেখতে পায়—গোড়ে তো শালখানাই

পুড়ুক, আমি কেন মরি! যা ভেবেছিলাম তাই। শালখানা চোখে পড়তেই অবিন সেটাকে সজোরে গঙ্গার দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। বসন্তের ফুলে-ফুলে-বিছানো ফুলশয্যার চাদরখানার মতো সেই অপূর্ব শালটি উড়তে-উড়তে গিয়ে জলে পড়ল—দিক্‌বিদিক যেন আলো করে। আমি বল্লেম—"ওহে করে কি?"—"পরের জিনিষ লোষ্ট্রবৎ পরিত্যাগ কল্লেম—যার জিনিষ তাকে জোচ্চোর বলে গালাগালি দিয়ে তাড়িয়ে নিজের পকেটে সেটা না পুরে।"—বলেই অবিন আমার দিকে কট্‌মট্ করে চেয়ে রইল। আমি এত-ক্ষণে বুঝলেম শালখানা কাবুলীকে নিয়ে যেতে বাধা না দিলে জুয়াচুরির কলঙ্কটা কাবুলী পর্য্যন্তই থাকতো, আমার গায়ে গড়িয়ে লাগতো না। অবিন পুলিশ কাবুলী এবং বাটপাড়ির কলঙ্ক তিনটে থেকে বেঁচে গেল; ধরা পড়লুম আমি—জয়মিত্রের ঘাটটার ঠিক আড়পারে!

তারপর থেকে বসন্তের হাওয়ায় আমি রবাবের ছেঁড়া তারের টঙ্কার শুনতে পাচ্ছি আর সেই শালের উল্টো-পিঠে লেখা ডাইনি-বুড়ির কাঁচা-পাকা চুলের ঢেউটাই গঙ্গার নির্ম্মল স্রোতকে ঘোলা করে দিয়েছে দেখছি। পাকা ধানের সোনার, কচি ঘাসের সবুজে, দিনের উদয়-অস্তের রঙে, রাত্রির ঘুমের অন্ধকারে ছোপানো চার-বাগ শালখানা ফুলের জোলাধাসির মতো ভাসতে-ভাসতে আর-কোনোদিন যদি নতুনকরে আমার চোখে পড়ে তবে আবার তার কথাটা তুলবো; না হলে এই পর্য্যন্ত।

মাতু

আজকের সকালটা একেবারে কুয়াশায় ঢাকা,—এমন কুয়াশা এ-শীতে একদিনও হয়নি ;—জলস্থল-আকাশ দুধে-গোলা আলোয় মধ্যে ডুবে রয়েছে ; যেদিকে দেখি, মনে হচ্ছে যেন নাকের সাম্‌নে প্রকাণ্ড একখানা ঘসা কাঁচ ঝুলছে। জাহাজের সব বেঞ্চিগুলো শিশিরে ভিজে উঠেছে,—কোথাও একটু বস্‌বার স্থান নেই। সাতটা-পঞ্চাশে জাহাজ ছাড়বার কথা, আটটা-পঁচিশ হয়ে গেল তবু আজ সহযাত্রী কারুর দেখা নেই। জাহাজের সারেং কান-ঢাকা টুপি, পশমের পাঁচরঙা গলাবন্ধ আর লক্ষ্ণৌ ছিটের ময়লা একখানা বালাপোশ জড়িয়ে একটা মেছুনির ঝুড়ি থেকে বেছে-বেছে ভালো মাছগুলি লালরঙের একটা বাল্‌তিতে নিজের জন্যে তুলছে। জাহাজ আজ ঘুমন্ত হাঁস ;—যেন ডানার ভিতর মুখগুঁজে জলের ধারটিতে স্থির হয়ে রয়েছে। আমি ওভার-কোটের কলারটা দুই কানের উপরে বেশ-করে টেনে দিয়ে বসে রয়েছি। বাদলার দিনে স্কুলের খালি বেঞ্চখানায় বসে যেমন, ঠিক তেমনি আজ মনে হচ্ছে—পাড়ি পাই তো বাড়ি পালাই। এমন সময় সামনে কুয়াশার ভিতর থেকে শুনলুম কচি গলায় কে ডাকলে—'মা'!

বড়বাজারের এই ঘাটটা—যেখানে সূর্য্যোদয়ের আগে থেকে সূর্য্যাস্তের অনেক পরেও কর্ম্মকোলাহলের বিরাম নেই, সেখানে আজ সব জাহাজগুলো ভেঁপু থামিয়ে কুয়াশার ভিতরে চুপচাপ

দাঁড়িয়ে আছে। সে যে কি-রকম নিঝুম তা বুঝতেই পারছো। এরি মধ্যে কচি-গলার সেই 'মা'শব্দ—সে যে আমার অন্তরের অনেক দূরে গিয়ে পৌঁছল, তা কি আর বলতে হবে! আমি যেন ঘুম থেকে চম্‌কে উঠে সাম্‌নের দিকে চেয়ে দেখলুম—ঠিক আমাদের ফার্ষ্ট ক্লাসের ডেকের দিকে মুখ-করে হুখানা বড়-বড় দোতলা জাহাজ ছুটো প্রকাণ্ড গোল বারান্দা নিয়ে কুয়াশা ঠেলে আধখানা বার হয়েছে; একটা বারান্দার নীচে বড়-বড় ইংরিজি কালো অক্ষরে লেখা রয়েছে—'মাতু', আর-একটায়—'কুরিস্তান'। শেষের জাহাজখানায় লোক দেখলেম না; কিন্তু 'মাতু' বলে যে জাহাজ, তার ওই বারান্দার নীচে, যেখানে জাহাজের রান্নাঘর, সেখানে দেখছি, ঝক্‌ঝকে কতকগুলো তামার ডেক্‌চির কাছে বসে নীল পাজামা-পরা একটা ছোকরা-খালাসী রং-করা একটা পাখীর খাঁচা বেশ-করে জল দিয়ে ধুচ্ছে। ঠাণ্ডা জলের ছিটে যতবার পড়েছে, ততবারই খাঁচার পখী সে মা মা বলে চীৎকার করে উঠছে; আর সেই ছোকরা খালাসী তাকে কথ্য এবং অকথ্য ভাষায় গাল পেড়ে চলেছে।

পাখী-পোষবার সখ আমার চিরদিনই আছে—তার উপর পড়া-পাখী;—আমি একেবারে আমাদের ডেকের নাকের ডগায় গিয়ে দাঁড়িয়ে মানুষের আর পাখীর রঙ্গটা দেখে নিচ্ছি, এমন সময় পিছন থেকে অবিন আস্তে-আস্তে আমার কাছে এসে বল্লে—"পাখীটা ভালো-করে দেখবে তো আমার সঙ্গে এসো।"

আমি একটু ইতস্তত করছি দেখে অবিন আমাকে আবার বল্লে—"এই ঠাণ্ডায় কেন মিছে কষ্ট পাচ্ছ? আমাদের এজাহাজ সাড়ে-ন'টার আগে ঘাট ছেড়ে নড়ছে না। চল, ওই জাহাজখানার বুড়ো মালেকের সঙ্গে বেশ আলাপ আছে, সেখানে বসে বেশ আরামে তামাক খাওয়া যাবে আর গল্পগুজবও হবে। মীরসাহেব লোক বেশ, আলাপ করে খুসি হবে। আর ঐ 'মাতু' জাহাজ-খানার মতো অমন জাঁকালো জাহাজ আর নেই,—আগাগোড়া গিল্টি আর আয়না দিয়ে মোড়া। "ওর ক্যাবিন্‌গুলো দেখবার জিনিষ।"

আমি অবিনের সঙ্গে আর-একটা প্রকাণ্ড জেটি আর পাটের গোডাউন পেরিয়ে মাতু জাহাজে গিয়ে উঠলুম। জাহাজ তো নয় যেন একটা প্রকাণ্ড বাড়ি জলে ভাসছে! এক-একটা ডেক্ যেন এক-একটা কন্‌গ্রেসের প্যাণ্ডাল—এদিক থেকে ওদিকে নজর চলে না। পিতলের চাদর আর রবার-সিট্ দিয়ে মোড়া দোতলার সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে আমরা দৈত্যপুরীর সাতমহলের মতো সোনা আর স্ফটিকে মোড়া সেই জাহাজের ক্যাবিনগুলো একে-একে দেখে বেড়াচ্ছি, এমন সময় এক খালাসী এসে বল্লে—"মীর সাহেব আপনাদের ছেলাম দিয়েছেন।"

আমি অবিনের সঙ্গে মীর-সাহেবের খাস-কামরায় গিয়ে দেখলেম—এক বুড়ো নাখোদা নেওয়ারের এক খাটিয়ায় বসে তামাক টানছেন; পাশে এক ডাবা পানের খিলি। তাঁর পিছনে

খোলা জানলার কাচের ভিতর দিয়ে পাটের গোডাউনের টিনের ছাদের একটা আবছায়া দেখা যাচ্ছে। দস্তুরমত আদর-আপ্যায়নের পর মীর-সাহেব অবিনের দিকে চেয়ে হেসে বল্লেন—"এবার অনেক দিন পরে এ অঞ্চলে এলেম ;—সেই ছবছর পূর্ব্বে আপনার সঙ্গে দেখা, আর আজ এই !"

অবিন আমাকে দেখিয়ে বল্লে—"এই বন্ধুটিকে আপনার কাছে নিয়ে এলেম ; এঁর বড় পাখীর সখ ; এঁর জন্যে সিঙাপুর থেকে এবার একটা কাকাতুয়া এনে দিতে হবে। যাহোক এবার আপনার সফরের গল্পটা বলুন।"—বলেই অবিন খপ্-করে মীর-সাহেবের বিনা অনুমতিতে ডাবা থেকে এক-থাবা পান তুলে নিয়ে ছুটো নিজের গালে, আর গোটাচারেক আমার হাতে গুঁজে দিয়ে চোখবুজে সোজা-হয়ে বেশ জমিয়ে বসল। আমি পান ক'টা হাতে নিয়ে ইতস্তত করছি দেখে মীর-সাহেব বল্লেন—"পান খান্, না হলে গল্প জম্‌বে না।"—বলেই মীর-সাহেব সুরু কল্লেন—"এদিকে সিঙাপুর, হংকং—ওদিকে সেকেন্দ্রা আর কুস্তন্‌তুনিয়া এইটুকুর মধ্যে কত ঘাটেই না আমার জাহাজ ভিড়লো! দিনে-রাতে সুদিনে-দুর্দ্দিনে আলোতে-অন্ধকারে এই পঁচাশী বৎসর কত নদীতেই না পাড়ি দিলুম, কত দরিয়াই না পার হলুম! কিন্তু এই ভাগীরথী—এ আমার মনকে কেমন যে টানে, তা আমি বোঝাতে পারবো না। এই গঙ্গাতীরেই আমার জন্ম, আর এই বাংলার মাটিতেই আমি ভূমিষ্ঠ হয়েছি। আমার কবর এই মাটিতে, কি

দরিয়ার অগাধ জলের নীচে খোদাতালা ঠিক করেছেন, তা তিনিই বলতে পারেন। কিন্তু আমার মন চায় যে এই নদীর ধারে যেন আমার শেষ-যাত্রার জাহাজখানা এসে ভেড়ে। কাল-বোশেখির ঝড়ের আগে-আগে তুফান ঠেলে যখনি যেখানে আমি জাহাজ, চালিয়েছি তখনি এই নদীতীরের ছবি—একটি প্রকাণ্ড বটগাছের তলায় সবুজ শেওলায়-ছাওয়া, আমার নিজের কবরের ছবিটি আমার মনে জেগেছে। ঘরের ছবিটি আমার বাংলাদেশের সঙ্গে গাঁথা নেই। এখানেই আমাদের ঘর-বাড়ি ছিল কিন্তু সে কেমন ছিল, নদীর এপারে ছিল কি ওপারে, তা আমার কিছু মনে পড়েনা। ব[redacted]র কেইবা ছিল—ভাই-বোন কাউকে মনে নেই। কেবল মনে আছে মাকে। অন্ধকারের মধ্যে জল্-জল্ করছে তাঁর রূপ—আর কিছু না। এইটুকু আমার খুব ছেলে-বেলার স্মৃতি, বোধ হয় যখন মায়ের কোলে মানুষ হচ্ছিলেম তখনকার।

এর পর থেকে ঘটনাগুলো অনেকটা স্পষ্ট করে আমি দেখতে পাই। তখন আমার বয়স কত বলতে পারিনে, গঙ্গার উপরে কতকগুলো কালো-কালো ডিঙি ছড়িয়ে পড়েছে, আমি তীরের উপরে বসে মা মা বলে চীৎকার করে কাঁদছি। পরণে আমার একটুক্রো কাপড় নেই; মুঠোর মধ্যে আমার দুটো টাকা। টাকা-দুটো রেলের টিকিট কেনবার জন্যে—এটুকু আমার বেশ মনে আছে। তার পর এক সন্ন্যাসী—তার মাথায় জটা, গায়ে ছাই,

কটা-কটা দাড়িগোঁপ—সে আমাকে এসে বল্লে—বেটা য়োতা কাহে?" আমি তাকে কেঁদে বল্লেম—আমাকে মায়ের কাছে দিয়ে এস, আমি দিল্লী যাব।" সন্ন্যাসী একটু হেসে আমার কাছে টাকা আছে কিনা শুধোলেন। আমি তাঁর হাতে আমার টাকা-দুটো দিয়ে দিলেম, আর তাঁর হাত-ধরে একটা অন্ধকার গলির মধ্যে ঢুকলেম। তারপর কি হল মনে পড়ে না। আমার জীবনের ঘটনাগুলোর মধ্যে আর-কোথাও ফাঁক নেই—এইটুকু ছাড়া।

এর পরে একদিন নতুন কাপড় পোরে, দিল্লী যাব বলে, লোটা-কম্বল পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে, সন্ন্যাসীর সঙ্গে প্রকাণ্ড একটা টিনের ছাদের নীচে কাঠগড়া-দেওয়া একটা জায়গ[illegible]য়ে রয়েছি। আমার চারিদিকে স্ত্রীপুরুষ, ছেলেবুড়ো, আরো কত লোক;—কেউ বসে, কেউ আগাগোড়া চাদরমুড়ি দিয়ে শুয়ে রয়েছে। ঘরখানার দুটো লোহার থামের মাঝ দিয়ে গঙ্গার জল দেখা যাচ্ছে। এমন সময় ঠিক এমনি-একখানা বড় জাহাজ এসে সেই ঘরখানার গায়েই লাগ্‌লো। সেটা এত বড় যে মনে হলনা যে জলে আছে। একটা সাহেব এসে আমাদের সবার হাত-পা, বুক-পিট টিপে-টুপে দেখে বড়-একখানা কাগজে কি লিখে দিয়ে গেল, আর অমনি কাঠগড়ার দরজা দিয়ে হুড়হুড় করে লোক গোরুর পালের মতো জাহাজে গিয়ে উঠল। সন্ন্যাসী আমার পিঠ-চাপড়ে বল্লে—"যা বেটা দিল্লী!" বলেই আমার হাত ধরে জাহাজে উঠিয়ে দিলে। আমি জাহাজে উঠেই ফিরে দেখ্‌লেম সন্ন্যাসী ভিড়ের মধ্যে কোথায়

মিশিয়ে গেছে। দিল্লী যাবার উৎসাহে আমার মন এতক্ষণ আনন্দে দুলছিল, সন্ন্যাসীকে লুকুতে দেখে হঠাৎ যেন আমার ভিতরটা একবার স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল। কতক্ষণ এমন ছিলেম বলতে পারিনে, হঠাৎ একসময় জলের হুস্-হুস্ শব্দ শুনে চম্‌কে দেখি জাহাজ চলছে;—আলো-অন্ধকারে জলের উপরটা যেন বোয়া সাপের পিঠের মত দেখাচ্ছে। একটা সাদা টুপি ও খয়েরী কোট-পরা কালো সাহেব এসে আমাকে জাহাজের একদিকে টেনে বসিয়ে দিলে। সেখানে একদল মেয়েমানুষ আমাকে দেখে হঠাৎ চীৎকার করে বুক-চাপড়ে—কেউ বেটার নাম কোরে, কেউ বাপ বোলে, কেউ ভাইরে বোলে কাঁদতে লাগল। সাহেব তাদের এক ধমক দিয়ে চলে গেল। সেই সব সহযাত্রীর কথায়-বার্ত্তায় জান্‌লুম এখানা কুলীর জাহাজ। কিন্তু তখন আমি এত ছোট যে কুলী কাকে বলে বুঝতেম না। সেই নদীর জল, আকাশের আলো, দূরে-দূরে তীরের বন, বালির চড়ার উপরে সূর্য্যের উদয়-অস্ত দেখতে-দেখতে ক'দিন আমার আনন্দে কেটে গেল।

তারপর চা-বাগানের ইতিহাস। সেখানে মানুষের মেরুদণ্ড মানুষ হয়ে কেমন-করে যে তিলে-তিলে মুচড়ে ভাঙে তা দেখেছি; মানুষের উত্তপ্ত রক্ত চাবুকের চোটে ক্রমে-ক্রমে ঠাণ্ডা হয়ে কি-কোরে যে মানুষ ভারবাহী জীবের মতো মাটির দিকে ঝুঁকে-পোড়ে পরের বোঝা টান্‌তে-টান্‌তে শেষ-একদিন তপ্ত বালির উপরে মুখ-গুবড়ে বুক-ফেটে মরে—তাও দেখেছি; কিন্তু তবু যর মনে হলে

এই চা-বাগানের ছবিটাই আমার মনের মধ্যে জেগে ওঠে। এখানে দুঃখও অনেক, সুখও অশেষ। মায়ের সন্ধানে এখানে এসে, শিশুকালে মাকে না দেখে আমার কি যে কান্না প্রাণের ভিতরে গুমরে উঠেছিল তা বোঝানো যায় না। আবার যেদিন এক-এক-দল ছেলে-হারা মা আনারসের কাঁটাগাছের বেড়ার আড়ালে তাদের কাদা-মাখা রোগা হাতে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধোরে দুপুরের রোদে-পোড়া মাটির উপরে চোখের জল ফেলতো, যখন কোনো-কোনো দিন রাঙা সাড়ি, গালার চুড়িপরা ছোট এক-একটা কালো মেয়ে চায়ের পাতা ছেঁড়বার সময় হঠাৎ আমার পিঠে ঝাঁপিয়ে পড়ে ভাই-বোলে আমার গলা জড়িয়ে ধরতো, তখনকার সুখ—সে তো বর্ণনা করা যায় না! তার পর, বসন্তকালে যখন ফুলে-ফুলে, পাখীর গানে, সোনার রোদে সবুজ পাতায় বাগানের চারিদিকের বন ভরে উঠেছে, তখন কাজের অবসরে যখন এক-একবার চেয়ে দেখেছি তখনি যে আমার মাকে না দেখে আমি থাকতে পারিনি। বাট-বছরের মধ্যে আমার শরীর-মন এক-দিনের জন্যে অবসন্ন হতে দিইনি। এ-শক্তি আমার নিজের মধ্যে ছিল না, কিন্তু আমার মা যিনি, তিনিই আমাকে দিয়েছিলেন। এই জন্যে বাগানের সাহেব-মালিক আমায় ভালোবেসেছিল আর মরবার সময় আমাকে তার চা-বাগানখানা লিখে দিয়ে গেল। তার আর কেউ ছিল না। সে ভালোবাসবার মধ্যে একমাত্র বাগানের কাজকে এবং সেই কাজ-চালাতে সম্পূর্ণ উপযুক্ত আমাকে ভালো-

যেসেছিল। কিন্তু মাহের ভুল বুঝেছিল। আমি বাগানখানাকে ভালোবেসেছিলেম—তার কেয়ারী-করা সাজানো চায়ের গাছগুলোর জন্যে নয়—ওই কাঁটা-গাছের বেড়ার ধারে-ধারে যে স্নেহ, ভালোবাসার লতাগুলো জড়িয়ে-জড়িয়ে উঠেছিল তারি জন্য। ওই বনের গাছ যেখানে ঝুঁকে-পোড়ে মায়ের মতো পথের ধূলোকে চুম্বন দিত, সেই ছায়াশীতল বন-পথগুলির জন্য আমি আমার সমস্ত ভালোবাসা পুষেছিলেম—ষাট বছর ধরে। চা-বাগানের ঠিক মাঝে, বাগানের যিনি মালিক, তিনি নিজের কবর নিজেই বানিয়ে গিয়েছিলেন—কালো পাথরের ছুঁচোলো একটা পালিস-করা থাম, তার গায়ে সোনার অক্ষরে বড়-বড় করে তাঁর নাম আর জন্মের তারিখ। তারি গায়ে তাঁর মরণের তারিখ লিখে আমি আমার বাগানের কাজ বন্ধ কল্লুম।

শেষ-কুলীর দল মাদোল বাজাতে-বাজাতে বন্দরের দিকে দেশের জাহাজ—ঘরমুখো জাহাজ ধরতে চলে গেছে। সন্ধ্যা-বেলার চাঁদ নীরব বাগান, নিঝুম বনের গায়ে চমৎকার আলো ফেলেছে। আমি ঘরে আলো-নিভিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রয়েছি, এমন সময় মাথার উপরে কড়িগলায় কে ডেকে গেল—"মা, মা, মা!" তার পর ছায়ার মতো একটা কে আমার ঘরের দরজা দিয়ে বনের দিকে ছুটে গেল,—মনে হল একটি ছোট ছেলে। আমি লাঠি-হাতে বেরিয়ে পড়লুম। বনের ধারে যেখানে একটা গুহা—যেখানে অন্ধকার মুখ-মেলিয়ে রয়েছে—সেইখানে সেই

ছোকরার দেখা পেলুম। সে একজন কুলী। আমি তাকে শুধোলুম —"সবাই গেল তুই যে এখানে ?" সে বল্লে—"মা পালিয়েছে, তাকে ছেড়ে আমি যাই কেমন করে ?" "আমি এদিক-ওদিক চেয়ে দেখছি কোথায় তার মা, এমন সময় ছেলেটা চেঁচিয়ে বল্লে— "মীর-সাহেব, ওই যে মা !" অন্ধকারে একটা ফুলের ডাল গুহার মুখে ঝেঁপে পড়েছে দেখলেম,—আর কিছু না। ছেলেটা অকথ্য ভাষায় তার মাকে উদ্দেশ-করে গাল-পাড়ছে শুনে আমি যখন অবাক হয়ে রয়েছি, সেই সময় একটা কালো পাখী উড়ে এসে তার কাঁধে বসল—"

মীরসাহেবের গল্পে বাধা দিয়ে আমি বল্লেম—"গোল-বারান্দার নীচে সকাল-বেলায় আপনার এই জাহাজে ঠিক তেমনি একটা ছেলেকে আমি দেখেছি।"

মীরসাহেব হেসে বল্লেন—"সে আমারি সঙ্গে আছে বটে। ছেলেটা সেই কালো পাখীটাকে দুই মুঠোর ভিতরে নিয়ে তাকে কেবলি চুমু খাচ্ছে আর গাল পাড়ছে ; আর পাখীটাও বলছে— মা, মা মা ! এমন সময় বন্দর থেকে শুনলেম কুলীর জাহাজ বাঁশী বাজিয়ে বেরিয়ে গেল। আমি ছেলেটাকে বল্লুম—"জাহাজ তো বেরিয়ে গেল, তুই এখন কেমন-করে দেশে যাবি ? ছেলেটা আমার দিকে ফ্যাল্-ফ্যাল্ করে চেয়ে থেকে বল্লে—"দেশ তো আমার নেই।"

—"তবে জাহাজে চড়ে কোথায় যাচ্ছিলি ?"

—"যেখানে সবাই চলেছে।"

আমি ছেলেটাকে আমার সঙ্গেই রাখলেম। 'মীর-সাহেব, আপনার দেশ কোথায়?'—এই প্রশ্ন করলে আমি ছেলেটাকে বলি, দেশ নেই। সে এখনো জানে এই জাহাজে করে সে আর আমি আমাদের দেশ খুঁজতে বেরিয়েছি।"

আমি মীর-সাহেবকে বল্লুম—"ছেলেটা পাখীকে অমন অকথ্য ভাষায় গালাগালি দেয়, আপনি ওর কাছ থেকে পাখীটা কেড়ে নিয়ে, ধমকে দেন না কেন? আহা পাখী যে এমন সুন্দর মা-বলে ডাকে এ আমার কখনো শোনা ছিল না।"

মীর-সাহেব বল্লেন—"বাবুজী, ওই ছেলেটারই কচি গলার 'মা' সুর, পাখীটা সেই চা-বাগানের বড়-দুঃখের কান্নার মাঝ থেকে শিখে নিয়েছে—ছেলেটার সবটাই গালাগালিতে ভরা নয়।"

এমন সময় সেই ছেলেটা নীল কোর্তা পোরে ছুটে এসে আমাদের বল্লে—"আপনাদের জাহাজ এখনি ছাড়বে, শীঘ্র যান্—কুয়াশা কেটে এখন রোদ উঠেছে।"

'মাতু'-জাহাজের পাশ দিয়েই আমাদের জাহাজ বেরিয়ে গেল। দেখলেম মীর-সাহেবের জাহাজের তিনটে চোঙা দিয়ে পাখীর বুকের পালকের মতো হাল্কা সাদা ধোঁয়া আকাশে উঠচে। ফিরে এসে যখন আবার আমাদের জাহাজ ঘাটে লাগ্‌ল, তখন মীর-সাহেবের জাহাজ যেখানে ছিল, সেখানে মস্ত-একটা ফাঁক দেখলুম।

সেই ফাঁক-দিয়ে দেখা যাচ্ছে কুলীর দল পাটের বোঝা বয়ে পিঁপড়ের মতো সার দিয়ে মালখানার দিকে চলেছে; আর একটা সোলার টুপি-মাথায় সাহেব ছড়ি-হাতে তদারক করে বেড়াচ্ছে।

শেমুষী

সেদিন মান্‌থ্‌লি-টিকিট রিনিউ করবার দিন; তার উপর সাগরযাত্রীর ভিড়; ষ্টীমার-ঘাটে বিষম গোলমাল লেগেছে। জাহাজ ছাড়তে বিলম্ব দেখে ক্রীকের ধারে ফুটপাতের উপর যেখানে অনেকগুলো নাগা-সন্ন্যাসী ধুনী-জ্বালিয়ে আগুন পোহাচ্ছে সেই-খানে অশথগাছের তলায় আমি একটু দাঁড়িয়েছি, এমন সময় রাস্তার ওপার থেকে অবিন টিকিট কিনে হন্‌-হন্‌ করে আমার কাছে ছুটে এসে বল্লে—"ওহে শেমুষী দেখবে তো এসো।"

লোকের ভিড়-ঠেলে জাহাজে উঠে দেখি ফার্ষ্ট ক্লাসে রোজ অবিন যেখানটায় বসে, সেইখানে একটা লোক;—চেহারাটা বেশ গম্ভীর, পরণে লুঙ্গী, গায়ে বেরালের লোমের একটা আলখাল্লা। আর তার মাথায় একটা অদ্ভুত টুপি—তেমন টুপি আমি কখনো দেখিনি—কতকটা টোপর, কতক পাগড়ী, কতকটা যেন বিলাতী ষ্ট্র-হ্যাট।

ষ্টীমারে উঠেই অবিন আমার হাত ছেড়ে সেই লোকটার দিকে সোজা এগিয়ে চল্লো। আমি দেখলেম অবিনের দুই-চোখের মাঝখানে ভ্রূ-কুটি বিদ্যুতের মতো চম্‌কে গেল। অবিন যেখানটিতে রোজ বসে, লোকটা ঠিক সেইখানেই বসেছে! তিন বৎসরের মধ্যে বেঞ্চের ঐ অংশটুকু থেকে অবিনকে বে-দখল করেছে এমন লোক—কি সাদা, কি কালো—আমি তো দেখিনি। লোকটার কপালে কি আছে ভেবে আমি বেশ-একটু চিন্তিত হয়েছি এমন সময় অবিন দেখি "ইয়েঃ সম্‌স্‌"—বলে লোকটাকে প্রকাণ্ড এক সেলাম বাজিয়ে অতি ভালোমানুষের মতো আমার পাশে, পিছনের বেঞ্চিতে এসে বস্‌লো! লোকটা অবিনের দিকে ফিরেও চাইলে না; সে কেবল নিজের বাঁ-হাতখানা সাপের ফণার মতো বাঁকিয়ে অবিনের মুখের কাছে একবার দুলিয়ে গট্-হয়ে বসে রইল। ঝুঁটি-কাটা ময়ূরের মতো অবিনকে একেবারে মুহ্যমান দেখে আমার আজ যেমন হাসি পাচ্ছিল, তেমনি বিস্ময়েরও অন্ত ছিল না। অবিনকে এ-রকম করে দমিয়ে দিতে পারে এমন-লোক আছে বলে আমার ধারণা ছিল না। আমি তাকে চুপিচুপি বল্লুম—"ওহে এই ভাগীরথীতীরে এবং নীরে এতকাল তুমি একা সিংহাসনে বিরাজ কচ্ছিলে, আজ আবার এ কোন্ ভাসুরক এসে উপস্থিত হল হে?" অবিন আমার কথার কোনো জবাব না দিয়ে, কেবল ইঙ্গিতে চুপ করতে বলে, চোখ-বুজে চুরুট টানতে লাগ্‌ল। নদীর মাঝ দিয়ে সারা পথটা তার মুখে আজ কথা নেই। আমিও চুপ

করে চেয়ে রয়েছি। দূরে দেখা যাচ্ছে বালির চড়ার উপরে গোটা-কতক নৌকো কাৎ হয়ে পড়ে আছে। আরো-দূরে সবুজ একটা আকের ক্ষেত; তার পিছনে একটা কলের চিম্‌নি থেকে একটু-একটু ধোঁয়া উঠ্‌ছে; একটা শঙ্খচিল নীল আকাশ থেকে আস্তে-আস্তে জলের দিকে নাম্‌ছে।

নদীনীর, বালুতীর, দুপুরের আলোয় মিলে আমাদের চারিদিকে যখন একটা দিবাস্বপ্নের সৃষ্টি করেছে আর আমাদের জাহাজখানা কুটীঘাট থেকে আস্তে-আস্তে ক্রমে-ক্রমে ওপারের দিকে মুখ ফেরাচ্ছে, ঠিক সেই-সময় অবিন হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে আমাকে এক ঝাঁকানি দিয়ে বলে উঠল—"ওহে সে-লোকটা গেল কোথায়?"

সাম্‌নের দিকে চেয়ে দেখি সেই প্রথমশ্রেণীর বেঞ্চখানা একে-বারে খালি;—সে অদ্ভুত টুপির আর চিহ্নমাত্র নেই। জাহাজ তখনো জেটি ছাড়ায়নি; আমি সেদিকে চেয়ে দেখলুম জনমানব নেই। গ্রামের পথ ঘাট-পেরিয়ে সোজা দেখা যাচ্ছে—সেখানে একটা মড়াখেকো কুকুর রাস্তার মাঝখানে ধূলোর উপরে মুখ-গুঁজড়ে শুয়ে রয়েছে—আর অন্য পথিক কাউকে দেখা গেল না। অবিন আমাকে সঙ্গে নিয়ে জাহাজের এধার থেকে ওধার, নীচের তলার কামরা মায় ইঞ্জিন-ঘরটা পর্য্যন্ত তন্ন-তন্ন করে খুঁজে এসে, সারেং থেকে সুকনী খালাসী এবং সকল-যাত্রীদের একে-একে সেই লোকটার হুবহু বর্ণনা দিয়া জেরা করে দেখলে সে-

লোকটাকে এ-জাহাজে উঠতেও কেউ দেখেনি, বসে থাকতেও কেউ দেখেনি, এবং কোনো ঘাটে নেমে যেতেও কেউ দেখেছে কিনা তাও জানা গেল না। আমরা দুজনে গিয়ে সেই সাম্নের বেঞ্চিখানা এবং তার চারিদিকটা এমন-করে সন্ধান 'কল্লুম যে সেই লোকটার লোমশ আলখাল্লার যদি একগাছিও লোম সেখানে থাকতো তবে সেটা আমাদের কাছে ধরা পড়তোই পড়তো। কিন্তু এ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! লোকটা এলো, বস্‌লো এবং চলে গেল অথচ পৃথিবীর কোনোখানে একটু আঁচড়ও পড়ল না! কোনো-কোনো-দিন ঘন কুয়াসার মধ্যে দিয়ে পারাপার করবার সময় দেখেছি কোথাও কিছু দেখা যাচ্ছে না, হঠাৎ একখানা নৌকো তার দাঁড়িমাঝি মালপত্র রসারসি নিয়ে চকিতের মতো কুয়াসার গায়ে ফুটে উঠেই আবার মিলিয়ে গেল;—এ লোকটা ঠিক যেন তেমনি করে আমাদের দেখা দিলে! আমার মনের মধ্যে কেমন যেন শীত করতে লাগল। প্রথম-শ্রেণীতে অবিনের সঙ্গে একলা বসে থাকতে আমার ভালো লাগলো না; আমি তৃতীয়-শ্রেণীতে যেখানে ইঞ্জিনের ধারে আগুনের তাতে কতকগুলা চিনেম্যান তাদের ক্যাকাসে মুখগুলো তাতিয়ে নিচ্ছে সেইখানে গিয়ে দাঁড়ালুম।

"শেমুষী" বেঞ্চ খালি করে দিলেও অবিন কিন্তু আজ তার নিজের সিংহাসনে বসতে বড় উৎসাহ প্রকাশ কল্লে না। সে বেঞ্চিখানার পিঠে হাত্ রেখে চুপ-করে দাঁড়িয়ে, থেকে-থেকে খানিক চুরুট টেনে-টেনে দোতলায়—যেখানে সারেংসাহেব চাকা ঘুরিয়ে

কম্পাসের কাঁটা দেখে জাহাজ চালিয়ে যাচ্ছে—মই-বেয়ে সেখানে উঠে গেল। সাধারণ যাত্রীর দোতলায় যাবার হুকুম নেই, আমি নীচেই রইলুম। কিন্তু অবিনের গতিবিধি সর্ব্বত্র। সে দোতলার উপর থেকে দিব্যি আমাদের নাকের উপর দুই পা ঝুলিয়ে সারেং-সাহেবের হুঁকোর মজলিস জম্‌কে তুল্লে। সারা পথটা তার আর কোনো খবরই পেলুম না। ফিরতি-ষ্টীমার যখন আহিরীটোলার ঘাটে ভিড়ছে, এমন সময় অবিন নেমে এসে বল্লে—"ওহে কাল আবার আসছো তো ?"

আমি বল্লুম—"আসছি, কিন্তু এ-জাহাজখানার দিকেও আসছি নে !" ঘাটে নেমে জাহাজখানার নাম দেখে নিলুম—'প্রতিভা'।

তার পরদিন থেকে বড়বাজারের ঘাটে 'প্রতিভা'টি বাদ দিয়ে এ-লাইনের আর যত-নামের যত-জাহাজ সব ক'খানাতে চড়ে বেড়াই কিন্তু অবিনকে আর দেখতে পাই নে ! সে যে কখন কোন্ জাহাজ ধরে যাতায়াত করে, তার আর সন্ধান পাই নে। দূরবীন লাগিয়ে দেখেছি 'প্রতিভা'র ডেকে তার জায়গা শূন্য পড়ে আছে! লোকটা গেল কোথা ? শেমুষীর মতো তাকেও গা-ঢাকা হতে দেখে আমি একদিন সন্ধ্যার সময় তাদের আহিরীটোলার ঘাটে নেমে জেটি পেরিয়ে অবিনদের বাড়ির দিকে চলেছি, এমন সময় রাস্তার মোড়ে দেখি অবিন হন্-হন্ করে ষ্টীমার-ঘাটের দিকে চলেছে ; সঙ্গে আলবোলা আর ক্যাম্বিসের ব্যাগ নিয়ে তার চাকর গোবিন্দ। তখন সন্ধ্যা সাতটা হয়ে গেছে। বড়বাজার থেকে শেষ-ষ্টীমার রাতের

অন্ধকারে ভেঁপুর শব্দ এবং সার্চ্চ-লাইটের আলোর শুঁড় দোলাতে-দোলাতে রক্তচক্ষু একটা বিরাট জলজন্তুর মতো আস্তে-আস্তে জেটির গায়ে এসে থাম্‌লো। অবিনকে এতরাত্রে জাহাজে উঠতে দেখে আমার ভারি-একটা কৌতূহল হল। আমি তার অসাক্ষাতে ষ্টীমারে উঠে থার্ড ক্লাসের একটা খালি বেঞ্চে শালমুড়ি দিয়ে বসলুম। আমি, অবিন এবং গোবিন্দ ছাড়া আর একটিমাত্র সহযাত্রী একটা প্রকাণ্ড ঝুড়ির আড়ালে চুপ-করে বসে রয়েছে। জাহাজ অন্ধকার জল কেটে সন্তর্পণে চলেছে। তীরের আলোগুলো কালো জলের গায়ে সাপ-খেলানো সোনার এক-একটা রেখা টেনে দিয়েছে। আকাশের আর জলের আঁধার এক হয়ে গিয়ে নদীটা অকূল সমুদ্রের মতো মনে হচ্ছে। এমন সময় অবিন আমার নাম ধরে ডেকে বল্লে—"ওহে ইয়ার, শেমুষীর অত কাছে বসা নিরাপদ নয়; এদিকে চলে এস।"

অবিনের চোখ এড়াতে পারি নি দেখে আমি তার কাছে গিয়ে বল্লুম—"এখানে আবার শেমুষী কোথায় পেলে?" অবিন একবার ঝুড়ি-কোলে যে-মানুষটা, তার দিকে ঘাড়-হেলিয়ে সুরু কল্লে—শেমুষী কি এক-রকম? তারা নানাবেশে জগৎময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। —অভিধানে শেমুষী অর্থে দেখবে বুদ্ধি।" আমি বল্লুম—"বুদ্ধিমন্ত জীবমাত্রেই যদি শেমুষী হয়, তবে তুমি-আমিও তো শেমুষী!" অবিন বল্লে—"না, ওই বুদ্ধির সঙ্গে অতির যোগ হলে তবে হয় শেমুষী। যেমন তোমার ঠগী, তেমনি শেমুষীর একটা দল এখনো

আছে। আমরা যেমন কালেজ থেকে ডিগ্রী নিয়ে বেরোই, এদেরও মধ্যে তেমনি অনেক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তবে হয় শেমুষী। আজন্ম-শেমুষীও দুচারজন আছে। তারা কেমন জানো? হতভাগা লক্ষীমন্ত, ধার্ম্মিক ও পাজি, ভদ্র, অভদ্র, মহাত্মা এবং দুরাত্মা, সুবুদ্ধি দুর্বুদ্ধি, পাজি, ছুঁচো, মহাশয়, দুরাশয়, পণ্ডিত ও গোমূর্খ, সমালোচক ও গোবদ্যি, বুজরুগ ও বেচারা একত্র মেশালে যা হয় তাই। এরা স্মরণমাত্রে যেখানে খুসি যেতে পারে, যা খুসি তাই করতে পারে; —ঘটি-চালানো, বাটি-চালানো থেকে মায় তোমার লোহার সিন্ধুকের ক্যাসবাক্স পর্য্যন্ত সরানো—হোসেন খাঁর যত বুজরুকী, সব এঁদের জানা আছে। এঁরা ইচ্ছে করলে অফুরন্ত তূণ, অক্ষয় কবচ, সোনার কাঠি, রূপোর কাঠি, বিশল্যকরণীর মলম—এমন-কি ঘুমের দেশের রাজকন্যাকেও তোমার মুঠোয় এনে দিতে পারেন। স্বর্গের অপ্সরী এঁদের দাসী; দেবতাগুলো হুকুমের চাকর, আর ভূতগুলো ইয়ার। মনে কল্লে একরাত্রের জন্যে এঁরা তোমাকে ইন্দ্রের অমরাবতীতে, কালীফের বোগদাদে, এমন-কি এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে ঘুরিয়ে আনতে পারেন অথচ তোমার গায়ে একটু ঘাম দেবে না। এমনি একজন শেমুষীকে সেদিন দেখেছ। কিন্তু আজ যে ঐ ঝুড়ি নিয়ে ওধারে ভালোমানুষটি বসে আছে দেখছ, ওঁকে চিনেছ?"

লোকটা আমার একেবারেই অচেনা। অবিন আমার কানে-কানে বল্লে—"উনিই সেই দিনের শেমুষী; ওঁরই পাল্লায় একবার

পড়ে একটা স্বর্ণমৃগের পিছনে ছুটতে-ছুটতে আমার প্রাণ গিয়েছিল আর কি! আবার উনি যে কার সর্ব্বনাশ করতে কিম্বা কার-বা কি ভালো করতে এখানে এসেছেন, তাই ভাবছি।"

লোকটার চেহারায় কোনো-রকম শেমুষীত্ব ছিল না। আমি অবিনকে বল্লুম—"নির্ভয়ে তোমার শেমুষীর ইতিহাস বলে যাও, ও-লোকটা এথনি নেমে যাবে।"

অবিন আমার দিকে একটু ঝুঁকে বল্লে—"দেখবে তবে?" বলেই অবিন তাঁর বুকের পকেট থেকে একটা বনমানুষের হাড়ের বাঁশী বার করে বল্লে—"এই হল শেমুষীদের বুকের হাড়ের বাঁশী। গান এবং এই বাঁশীর সুর—এই দুই হচ্ছে শেমুষী তাড়াবার এক-মাত্র ওস্তাদ। তুমি গান ধর; আমি বাজাই।"

হাড়ের মধ্যে থেকে যে অমন সুর বার হয় তা আমার ধারণা হয়-নি এবং অবিনও যে এমন বাঁশী বাজায় তা আমি আগে জানতেম না। সুর যেমন গিয়ে অন্ধকারকে বিদ্ধ করলে, অমনি মনে হল যেন রাত্রির নীল পর্দ্দা খুলে দলে-দলে তারা আমাদের দিকে উঁকি দিচ্ছে; জলের শব্দ এতক্ষণ কানে আসে নি কিন্তু এখন যেন শুনি জলও ঐ সুরে, বাতাসও সেই সুরে তাল দিচ্ছে। আর মনে হল রাত্রির রং ক্রমে যেন পাতলা হয়ে আসছে। শিবতলার শ্মশানঘাটের কাছে জাহাজ এসে স্থির হল। পারে একটা চিতার আগুন ধুধু জ্বলছে। সেই লোকটা ঝুড়ি-মাথায়

জেটীতে নেমে দাঁড়াল। আমি দেখলেম সেটা ঝুড়ি নয়, সেটা তার সেই টুপিটা। অবিন বল্লে—"দেখলে ?" দেখতে আমার ভুল হয়-নি কিন্তু শেমুষীর সঙ্গে তার কি লড়াই বেধেছিল যখন তাকে প্রশ্ন কল্লুম সে বল্লে—"ভুলে গেছি, মনে নেই।"

ইন্দু

প্রিয়দর্শন, প্রিয়ভাষী, সদাই-হাস্যমুখ, ভায়া-আমার মূর্ত্তিমান আনন্দের মতো,—পণ্টুনের পুলিশ থেকে জাহাজের যাত্রী, সারেং, খালাসী সকলের কাছে প্রিয় ; কেবল অবিন ডাকে তাঁকে প্রিয়া বলে !

কবে কোন্ সূত্রে ভায়া যে আমার ষ্টীমারের 'শুশুক-সভা' বা ডল্‌ফিন্-ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট অবিনের কাছ থেকে এই সম্মানের উপাধিটা লাভ করেছিলেন তা আমার মতো একজন নতুন-শুশুকের জানা সম্ভব নয় ; কেন না ষ্টীমারের ডেকে সবেমাত্র একটি শীতকাল কাটিয়ে আমি প্রথম-বসন্তে পা দিয়েছি, সুতরাং শুশুক-সভার বাই-ল অনুসারে আমার এখনো দুধে দাঁত ওঠেনি,—আসল বয়েস আমার যতই হোক না।

এখানকার নিয়ম-অনুসারে ক্রমান্বয়ে চার-পাঁচটা বছর, দিন-আট-প্রহর, ষড়ঋতুর সবক'টাতে জল-বাতাস আলো-অন্ধকারে খেয়া

দিয়ে, চল্লিশের ঘাট পেরিয়ে, উনপঞ্চাশের বাতাসে পাল-তুলে, পঞ্চাশের পারে—যেখানে চিরবসন্তের কুঞ্জতীরে পাপিয়া পিয়া পিয়া বলে দিন-রাত ডাক্‌ছে, সেখানে আমার তরী নিরাপদে এনে ভেড়াতে হবে, তবে যদি পিয়ার খবর পাই! আমার সবে ছেচল্লিশ, সুতরাং উনপঞ্চাশে, সুবাতাসের সঙ্গে, পিয়ার খবরও আমার পেতে এখনো দেরি আছে—যদি না ইতিমধ্যে হঠাৎ ভালো-মন্দ একটা-কিছু ঘটে যায়। এমন দু-এক সময় ঘটে যে খবর না চাইতে খবরটা এসে জোর করে কানে ঢোকে, যেমন মেঘ না চাইতে জল, এবং খালি জল চাইতে যেমন জল-খাবারের থালা;—যেটা বলব সে-কাহিনীটা এমনি-করেই আমার কাছে পৌঁছল।

হচ্ছিল সেদিন লাঠি-ভাঙার মাম্‌লা। অবিন আজ ক'দিন ধরে লাঠি ভাংবার চেষ্টায় ফিরছে—কারু পিঠে নয় বটে; কিন্তু লাঠি-বংশ তাতে-করেও যে রক্ষে পাবে, এমন আশা কিছুমাত্র নেই। আমরা সবাই লাঠি আনা ছেড়ে দিয়েছি। কেবল ভায়া-আমার, তাঁর নিজের লাঠি আঁকড়ে রয়েছেন! তিনি অবিনকে লাঠি ভাংতে উস্কে দেবার মূল; সুতরাং তাঁর লাঠি যে চিরদিন অক্ষত-শরীরে বর্ত্তমান থাকবে সেটা আশা করা অন্য লোক হলে যেতোনা, কিন্তু তিনি অবিনের প্রিয়া-উপাধির পাত্র, সেইজন্যই যদি তাঁর লাঠিটাও বেঁচে যায়। সমস্ত জাহাজের মধ্যে এখন দুটিমাত্র লাঠি। এক, ভায়ার হাতের ঘোড়ার কাটা-পা-দেওয়া আবলুসের ছড়ি, আর অবিনের হাতের বাঁশীর উপরে মিনের কাজ-

করা আধা-পাখী আধা-মানুষ একটি কিন্নরী-বসানো হিমালয়ের দেবদারু যষ্টি।

এই দুই লাঠিতে যেদিন ঠোকাঠুকি বাধ্‌লো, সেদিন জলে-বাতাসে মেঘেতে-আলোতে কোনো বিবাদ ছিল না। এমন-কি, ওস্তাদী রাগরাগিনী আজ বাদী-বিবাদী সব সুরগুলো নিয়ে, আমাদের কাছ থেকে দূরে ছিল। একটা আরাম আর শান্তির মধ্যে দিয়ে জাহাজ চলেছে উত্তরের হাওয়া কেটে। জলের ঢেউ-গুলোতে কিছুমাত্র চঞ্চলতা নেই; যেন ঘুমন্ত বুকের নিশ্বাসের মতো আস্তে উঠছে, পড়ছে। সূর্য্যাস্তের দিকে কোনো রঙের খেলা নেই। স্বর্ণচাঁপার মতো একটি স্থির দীপ্তি সমস্ত-পশ্চিম আলো-করে রয়েছে। তারি উপরে তীরের গাছ যেন কালি দিয়ে আঁকা দেখছি! ভরা-পালের নৌকো যেমন, আজকের সন্ধ্যায় সমস্ত পৃথিবী তেমনি যেন চম্পাই রঙের প্রকাণ্ড পালখানি তুলে, রাত্রির মুখে স্বচ্ছন্দ-গতিতে ভেসে চলেছে নিঃসাড়ায়। প্রাতঃসন্ধ্যারি অরুণোদয়ের তপ্তকাঞ্চনের সঙ্গে কতটা হীম মেশালে সায়ংসন্ধ্যার এই চাঁপাফুলি আলোর রংটি পাওয়া যায়—এটা যখন আমি বিশ্বকর্ম্মার কাছ থেকে মনের নোট্‌বুকে টুকে নিচ্ছি, থার্ড ক্লাসের একখানা বেঞ্চির কোণে বসে, সেই সময়. ফার্ষ্ট ক্লাসের দিকে করেন কি! 'করেন-কি'! রব উঠলো! কেউ জাহাজ থেকে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল কি না দেখবার জন্যে তাড়াতাড়ি গিয়ে দেখি অবিন তার হাঁটুর চাড়া দিয়ে তার নিজের লাঠিখানা ধনুকের মতো

বেঁকিয়েছে ; তার মুখ গোলাপফুলের মতো রাঙা ; আর-একটু হলেই লাঠিখানা দু-টুকরো হয়ে গঙ্গা পাবে। ভায়াই যে আজকের ধনুক-ভঙ্গের নাটের গুরু এবং তাঁর লাঠিটা বাঁচাতে তিনি অবিনকে আপনার লাঠি ভাঙতেই যে উস্কে দিয়েছেন, এটা বুঝলুম। অবিনের লাঠিটা এত সুন্দর যে সেটাকে ভেঙে-ফেলা আর একটা মানুষের ঘাড়মট্‌কে জলে ফেলে-দেওয়ায় আমার কোনো তফাৎ মনে হল না। মানুষের সৃষ্টিকে নষ্ট করাও যা, ভগবানের সৃষ্টিকে আঘাত দেওয়াও তাই,—একই পাপ আমি মনে করি। অবিনের লাঠির মাথায় সেই কিন্নরীর বাঁশীর সাতটা সুর যেন একটা কান্না নিয়ে আমাকে মিনতি করতে লাগল—'বাঁচাও, বাঁচাও!' আমার বুকের মাঝে কেমন করতে লাগলো। কিন্তু মুখ দিয়ে আমার একটি কথাও বার হল না। দেখলেম লাঠিটা ক্রমে বেঁকছে। লাঠি এতটা যে নুইতে পারে তা আমি ধারণাই করতে পারি-নি! পাহাড়ের রস টেনে বেড়েছিল সেই সরু দেবদারুর ডাল! অবিন সমস্ত জোর দিয়েও তাকে ভাংতে পারলে না। লাঠিখানা বেঁকে সাপের মতো তার দুই পা জড়িয়ে ধরলে। তখন আমি সাহস-করে এগিয়ে গিয়ে অবিনের হাত ধরতেই অবিন একটা নিশ্বাস-ফেলে লাঠিখানা ছেড়ে দিলে। দেখলেম সেই নিশ্বাসের সঙ্গে অবিনের মুখ কাগজের মতো পাঙাস হয়ে গেল। যেন একটা দুঃস্বপ্ন থেকে উঠে অবিন আমার দিকে চেয়ে দেখলে। তার পর আমাকে সেই লাঠিটা দিয়ে বল্লে—"নাও, তোমাকে দিলুম।"

লাঠিটা আমার কাছে শিল্প-হিসাবে খুব মূল্যবান সুতরাং সহজে বখশিস্ নিতে আমার লজ্জা হল। কিন্তু দিয়ে একবার ফিরে নেওয়া অবিনের কুষ্ঠিতে লেখেনি সুতরাং অন্তত তখনকার মতো হাস্যমুখে লাঠিটা আমায় নিতে হল। তাছাড়া লাঠিটাকে এখন কিছুদিন অবিন এবং তার প্রিয়া—আমার ভায়াটির কাছ-থেকে সরিয়ে রাখলে সবদিকেই মঙ্গল, এটাও সেই লাঠিটা খুসির সঙ্গে ধন্যবাদ দিয়ে বখশিস নেবার আর-একটা কারণও বটে। কাজেই লাঠিটা সেদিন আমার হাতে-হাতে আমার বাড়িতেই এল। তাড়াতাড়ি এক-কোণে সেটাকে রেখে আমি গায়ের কোট ছেড়ে রাখব, এমন সময় বাতির আলোয় লাঠির গায়ে একটি বিদ্যুতের রেখার মতো একটা নাম ঝল্কে উঠলো—'ইন্দু'। তিল তিল হীরের আলো দিয়ে সেই নাম লেখা। লাঠিটা বাইরে ফেলে রাখতে আমার আর সাহস হল না; আমি সেটাকে আমার সঙ্গে সঙ্গেই রাখলুম। সঙ্গে নিয়ে খেলুম, সঙ্গে নিয়ে শুলুম। অবিন লাঠিটাকে কি ভাবে দেখতো তা জানিনে কিন্তু তার ইন্দু বা ইন্দুমতী অথবা ইন্দুমুখীর লাঠিটা আমার যেন বৃদ্ধস্য তরুণীর মতো—চলিত-কথায় অন্ধের নড়ি—হয়ে উঠলো। পাছে তাকে হারাই, পাছে সুড়ঙ্গ কেটে চোর আমার কোলের কাছ থেকে চুরি করে পালায় এই ভাবনাতে আমার খেয়ে সুখ ছিল না, শুয়ে ঘুম ছিল না।

ক-দিন পরে অবিনের সঙ্গে যখন দেখা, তখন প্রথমে আমার ভয় হল অবিন বুঝি-বা লাঠিটা ফিরিয়ে নেয়,—যদিও অবিনের

কোনো-দিন এমন স্বভাব নয়, বেশ জানতেম। সেদিন আমি লাঠিটা খুব জোর-করে মুঠোর ভিতরে যে রাখলুম তা বলতেই হবে। সেদিন পূর্ণিমার রাত্রি, গঙ্গার একটা মনোরম শোভার মধ্যে দিয়ে জাহাজ চলেছে। পশ্চিমতীরে দেখতে পাচ্ছি সাহেব-মিস্ত্রীর বানানো রাজাদের একটা পুরানো বাগান-বাড়ী; পূব পারে দেখছি—প্রকাণ্ড একটি মন্দির—ঘাটের ধারেই; পূর্ণিমার চাঁদ জলের উপর দিয়ে একটি আলোর পথ আমাদের জাহাজ থেকে এই ঘাটের কোল পর্য্যন্ত রচনা করেছে। আর এই আলোর পথের ধারটিতে জাহাজের রেলিং-ধরে দাঁড়িয়ে অবিন—পূর্ণিমার চাঁদের দিকটিতে চেয়ে। অবিনকে আমি কতবার এমন-করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি কিন্তু আকাশের পূর্ণ ইন্দু আর আমার হাতের মুঠোর মধ্যে হীরের বিন্দু দিয়ে লেখা নামটার মিল দেখে মনটা আমার নড়ে উঠলো; আমার মনে হতে লাগলো অবিন হয় তো ওই আকাশের চাঁদের মধ্যে তার ইন্দুমতী বা ইন্দুমুখীকে দেখতে পাচ্ছে; হয় তো এই চাঁদের আলোয় ঝক্‌ঝকে তারাগুলির মধ্যে দিয়ে সে তার অনেক-দিনের-হারানো ইন্দুর কাছে বহু দূর-পথে—বহুদিনের পথে প্রাণের আকুতি বিরহী-যক্ষের মতো সারা-জীবন ধরে পাঠাচ্ছে—প্রতি পূর্ণিমায়! হয় তো পূর্ব্বজন্মে অবিনের এ-জন্মের ইন্দু ছিল অলকার তন্বী শ্যামা ইন্দুরেখা কিন্নরী। হয় তো সেখানে কোনো নাগেশ্বর চাঁপার কুঞ্জবনে অবিনে-তাতে প্রথম দেখা; তার পর প্রণয়-স্বপ্নের মাঝখানে দুজনের সহসা বিচ্ছেদ

এবং আকাশ-থেকে খসে-পড়া দুটি তারার মতো পৃথিবীতে তাদের ঝরে পড়া। এখানে এসে স্বপ্নটা আমার যেন আট্‌কে গেল। ওই আহিরিটোলার গলিতে যে অলকার কিন্নরী-ইন্দুরেখা ইন্দুবালা চক্রবর্ত্তী, ইন্দুমুখী ঝাঁ, ইন্দুমতী মুন্‌সী কিম্বা আরো-কোনো একটা নাম নিয়ে অবিনের ঘরে গৃহিণীপণা করতে-করতে অথবা অবিনের সঙ্গে কোর্টসিপ্‌ চালাতে-চালাতে হৃদ্‌যন্ত্রের রোগে হঠাৎ মারা পড়ল—অবিনকে তার শেষ-দান এই লাঠিটা দিয়ে—এটুকু মন আমার কিছুতে স্বীকার করতে চাইলে না। আমি ফাঁপরে পড়ে অবিনের দিকে চেয়ে দেখলেম সে আমার দিকে চেয়ে মিট্‌মিট্‌ করে হাস্‌ছে। আমি লাঠিটা সজোরে ঠুকে বলে উঠলেম—"এ হতেই পারে না।"

অবিন আস্তে-আস্তে এগিয়ে এসে বল্লে—"কি হতে পারে না হে আর্টিষ্ট ?"

আমি উত্তর কল্লেম—"আকাশের চাঁদের ভূতলে পতন! ইন্দুরেখা-কিন্নরীর তোমার আহিরীটোলায় গৃহিণীপণা!"

অবিন গঙ্গার ধারে বাগান-বাড়িটা দেখিয়ে বল্লে—"ইন্দুরেখা ও-পাড়ার ইন্দুভূষণ হলে কি তোমার আপত্তি আছে ?"

"কিছু না।"—বলে আমি লাঠিটা ইন্দুভূষণ যাকে দিয়েছিল তাকেই ফিরিয়ে দিলেম। কিন্তু সম্পূর্ণ অবস্তু ইন্দুরেখার সোনার কাঠিটা আমারি মুঠোয় রয়ে গেল ;—হাতের মুঠোয় নয়—মনের মুঠোতে।

অরোরা

অরোরার সঙ্গেও যে অবিনের পরিচয় ছিল, সেটা আমি জানতেম না। সে কবিতা করে, সুতরাং চাঁদের সঙ্গে তাকে কথা বলতে আমি স্বচক্ষে দেখেছি, রামধনুকের সঙ্গে তার আলাপ থাকা সম্ভব, কিন্তু অরোরার বাসা—সেখানেও যে তার গতিবিধি, এটা একেবারেই আমি ভাবি-নি!

কমলালেবুর মতো পৃথিবীর সব গোল ঠিক যেখানটিতে চাপা এবং যে-রাজ্যটা বেশ-একটু গভীর সেইখানেই চিরশীতল মণিমন্দিরে না-দিন না-রাত্রির দেশে একাকিনী অরোরা আলো বিতরণ করেন। লক্ষকোটী রামধনুকের শোভা এক-কোরে ঝালর বানিয়ে হাওয়ায় উড়িয়ে দিলে যে বাহার, বিনা-বরের বাসরে অরোরার রূপ কতকটা সেই ধরণের। নব-নব সৌন্দর্য্যের, রঙের এবং আলোর সে যেন একটা ভরা-জোয়ার বা চীনেভাষায় যাকে বলে 'টাইফুং'।

অরোরা-সম্বন্ধে এমনি একটা ধারণা আমার দূরে থেকে। জলজীয়ন্ত অরোরার বাসায় গিয়ে তার নির্ভুল পরিচয় এ-পর্য্যন্ত আমার ভাগ্যে ঘটে-নি; কেননা সেদিন পর্য্যন্ত আমি সেই দলভুক্ত ছিলেম যে-দলের কাছে রামের ধনুক, অরোরার রঙ্গমঞ্চের রং —এমনি আরো-অনেকগুলো জিনিষ হিন্দুদের বিশেষ-বিশেষ তিথিতে পটোল ঝিঙে ইত্যাদির মতো একবারে বর্জ্জনীয় ছিল।

আমি তখন কি জানি যে তলে-তলে আমার দলেও সব চলে? সেটা জানলে ও-দল থেকে নামকাটা সেফাইয়ের মতো অবিনের দলে এসে ভর্ত্তি হবার দরকার ছিল না।

যাই হোক, সেই অমাবস্থার রাত্রে তারার জুঁইফুলে-সাজানো নীল আকাশের নীচে, কলকাতার অন্ধকার গলিতে, আমরা দুই-বন্ধু যে অরোরার বন্ধ-খিড়কি খোলা না পেয়ে ঘুরে-ঘুরে হয়রান ও হতাশ হয়ে রাত সাড়ে-চারটেয় আহিরিটোলার ঘাটের রানায় বসে পয়লা-এপ্রেলের সকালবেলার প্রতীক্ষা করে রইলেম, সেটা স্বীকার করতে এখন আর লজ্জা নেই বা সে-লজ্জার কথাটা গোপন করতে দুটো মিথ্যে কথাও এখন আর আমার বলবার আবশ্যক হয় না;—অবিনের দলে মিশে এটা একটা সুবিধে আমি দেখছি।

অরোরার অভিসারে বেরিয়ে আর-কখনো অবিন এমন নিরাশ হয়েছিল কিনা বলতে পারিনে, তবে আমার সঙ্গ-দোষেই যে এ-রূপটা ঘটলো পয়লা-এপ্রেলের ঠিক পূর্ব্বরাত্রে, আমাকে সেটা জানাতে অবিন কিছুমাত্র ইতস্তত করলে না এবং আমিও সেটা মেনে নিলেম। কেননা দল ছাড়বার পূর্ব্বে, আমার আগের দলের যাঁরা বৃদ্ধ, তাঁরা বিশেষ করে আমারি উপরে দীর্ঘনিশ্বাস ও হুঙ্কার-গুলো নিক্ষেপ করে—পিতৃপুরুষের সঞ্চয়টার সঙ্গে নিজের উপার্জ্জিত পয়সা রূপ গুণ ও যৌবন নিয়ে তাঁদের কবল থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে আনায়—ইংরেজীতে এপ্রেলের ওই সম্ভাষণটাই আমাকে দিয়েছিলেন—যদিও মাসটা ছিল অন্য।

খানিক বসে থেকে অবিন মরীচিকামুগ্ধ হরিণের মতো অন্ধকারে আর-একবার তার অরোরার সন্ধানে ঘুরে মরতে গেল—অলিতে-গলিতে। আমি একা ঘাটে—যেখানটিতে সকালের একটি তারার আলো অনেকদূর থেকে এসে অন্ধকার তীরের কাছে জলের উপর নেমে দাঁড়িয়েছে, সেইখানটিতে চুপ-করে বসে রইলেম। ভোরের হাওয়ায় তখনো হিম মাখানো; নদীর মাঝে ময়লা কুয়াসা গতশীতের ছেঁড়া-কাঁথার একটা কোণের মতো এখনো ঝুলে রয়েছে। ঘাটের দুধারে বাঁধা সারি-সারি বোঝাই নৌকো জলের ধাক্কায় ঘুম-ভেঙে এক-একবার একটু নড়ে উঠে আবার ঝিমিয়ে পড়ছে। অন্ধকারের মধ্যে একটা চিতা কিছুদূরে শ্মশানঘাটের সমস্তটা এবং অন্ধকারের অনেকখানি আলোতে ভরে দিয়ে জ্বল্-জ্বল্ করে জ্বলছে। চলে যাবার সময়—জ্বলে ছাই হয়ে যাবার বেলায়, মানুষ কতটা আলোই না দিয়ে যাচ্ছে! কি আলোর রথই না তাকে নিতে এসেছে—যে হয়তো জীবনের অন্ধকারেই কাটিয়ে গেল রাত্রিদিন!

অন্ধকারের মধ্যে এতখানি আগুনের একটা টান আছে; শিখাগুলো যেন হাত-নেড়ে আমায় ডাকতে লাগলো। মন আমার প্রদীপের চারিদিকে পতঙ্গের মতো কতক্ষণ ধরে ঐ আগুনটার দিকে ঘুরছিল, হঠাৎ একসময় অন্ধকারে একখানা হাত, যেন বোধ হল, আমার দুই-চোখের উপর আস্তে-আস্তে চেপে পড়ল। ঠাণ্ডা হাত,—চাঁপাফুল আর হেনার গন্ধ-মাখানো আঙুলগুলি;

পাত্‌লা একখানি আঁচল, হাল্কা বাতাসের মতো উড়ে-উড়ে আমার গালে পড়ছে, ঠোঁটের খুব কাছে চন্দনের গন্ধ-ভরা গরম একটা নিশ্বাস অনুভব করছি! আশ্চর্য্য এই যে, সে আমার চোখ টিপে থাকলেও আমি তার মুখখানি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—একেবারে রাত্রির মতো কালো আর তারি মতো স্নিগ্ধ, সুন্দর! আমি একবার তার চাঁপার কলির মতো আঙুলগুলির উপরে হাত বুলিয়ে চুপি-চুপি বল্লেম—"অরোরা"! পিছন থেকে অবিন গলা-ছেড়ে হেসে উঠলো। আমি চমকে উঠে বল্লেম—"কিহে তুমি? অরোরা কোথা!" অবিন তার আঙুলটা দিয়ে শ্মশানের চিতা দেখিয়ে বল্লে—"শোনো বলি—"

সকালের হাওয়ায় কুয়াশার সাদা চাদর নাট্যশালার যবনিকার মতো আস্তে-আস্তে উঠে যাচ্ছে। নদীর পশ্চিম-পারে চিতার আগুন নিভে গেল। তারি শেষ-আভার মতো একটি সোনার রেখা নদীর পূব-পারের আকাশে ফুটে উঠল। অবিন তার কথা সুরু করে এমন সময় রামা বেহারা এসে খবর দিলে—"ডাক্তারবাবু আয়া।"

এত রাত্রে এখানে ডাক্তারবাবু কেন বুঝতে আমার সময় লাগলো। ঘুম ভাঙলে যেমন আমি ডাক্তারকে বল্লেম—"তুমি যে অসময়ে?" ডাক্তার হেসে বল্লেন—"আপনি আবার গল্পের খাতা নিয়ে বসেছেন? এ-রকম কল্লে আপনার অসুখ কিছুতে সারবে না। লেখা রাখুন; যান্ জাহাজে একটু বেড়িয়ে আসুন।"

লেখবার টেবিল এবং তার উপরে দেয়ালে ঝোলানো পাঁজির প্রকাণ্ড একটা এক এবং তার শিয়রে বড়-বড় অক্ষরে এপ্রেলটার দিকে আমার তখন দৃষ্টি পড়লো। আমি একবার ডাক্তারের দিকে, একবার নিজের দিকে চেয়ে সুবোধ ছেলের মতো গল্পের খাতা বন্ধ কল্লেম। ঘড়িতে তখন বেলা ছটো-উনপঞ্চাশ।

পর্-ঈ-তাউস্

ওপারে মুচিখোলার নবাবী নিলেমে চড়েছে, এপারে সবুজ ঘাসের ঢালুর উপরে দুই বন্ধুতে পা-ছড়িয়ে চড়ুই-ভাতির পরে একটু গড়িয়ে নিচ্ছি,—ঠিকে-গাড়ির ঘোড়াগুলো হঠাৎ কাজের অবসরে এক-এক-বার যেমন ধুলোয় লুটোপুটি খেয়ে হাত-পা ছড়িয়ে নেয়।

সেদিন একটা ভাঙা খাঁচা জলের স্রোতে ভেসে চল্‌তে দেখে আমি অবিনকে তামাসা করে বলেছিলেম—"ওহে খাঁচাটা নবাবের চিড়িয়াখানার দিক থেকে যখন ভেসে আস্‌ছে, তখন এটা পক্ষীরাজের খাঁচা হলেও হতে পারে। দেখ-না সাঁৎরে, যদি ওটাকে ধরতে পারো।" অবিন সাঁতার একেবারে না জানলেও সেদিন যে-কোরে জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, আর খাঁচাটা না তুলে, তাকে জেলে ডেকে জল থেকে তুলে আনার জন্যে আমার সঙ্গে

যেঁ-আড়িটা দিয়েছিল, চিরদিন সে-কথা আমার মনে থাকবে। এখন সে-কথা অবিন ভুলে গেছে; কিন্তু পক্ষীরাজ তার সেই যৌবনের দুঃসাহস বোধ হয় ভোলেনি; তাই হঠাৎ আজ তার স্থূল-শরীর কাশীপুরের ঘাট থেকে জাহাজে আমাদের দর্শন দিতে এসে উপস্থিত। গোছা-গোছা ময়ূরের পালক-হাতে সে লোকটা! কী অদ্ভুত যে দেখতে তাকে, তা আর কী বল্‌ব! ভণ্ডামির যত-রকম পালক হতে পারে সব-ক'টা দিয়ে সে আপনাকে সাজিয়েছে।

ছোট ছেলে পাখীর ছানা হাতে পেলে টিপে-টুপে পালক-ছিঁড়ে যেমন করে, অবিন ঠিক তেমনি এ-লোকটাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুল্লে। অবিনের গায়ে তুলো-ভরা ছিটের কালো কোট। এ-লোকটাকে ময়ূর-পুচ্ছে বিচিত্র দেখে আমার কথামালার দাঁড়-কাকের গল্পটা মনে পড়ল। আমার তুলনাটা ইংরিজিতে অবিনকে শুনিয়ে দিতেই সে-লোকটা আমার দিকে চেয়ে বলে উঠলো—"তোমার বন্ধুর কোটের নক্সাটা ভালো করে কি দেখা হয়েছে? ওটা যে আগাগোড়া ময়ূর-পালকে ভরা!"—বলেই লোকটা উত্তর-পাড়ার ঘাটে লাফিয়ে পড়লো—গাঁজার বিকট গন্ধে জাহাজ ভরে দিয়ে। আমি অবিনের কোটের দিকে চেয়েই একেবারে ঘাড়হেঁট কল্লেম।

আকাশে একটা রাম-ধনুক ময়ূরের পালকের রং-ধরে দেখা দিয়েছে। আবার যখন মুখ-তুলে চাইলুম তখন সবপ্রথম ঐটেই আমার চোখে পড়লো। আমি অবিনকে সেটা দেখাবো বলে

ডাক্‌তে গিয়ে দেখি অবিন সেখানে নেই। আশে-পাশে কোনো সহযাত্রী দেখলেম না। জাহাজের ডেক্ সমস্তটা খালি পড়ে আছে। তারি এককোণে আমাদের বাঁয়া-তবলা-জোড়া পড়েছিল। হঠাৎ সে-দুটো দেখি, দুখানা কোরে পালকের ডানা বের কোরে পাখীর মতো উড়ে পালালো। সঙ্গে-সঙ্গে জাহাজের খালি বেঞ্চিগুলো একে-একে পালক গজিয়ে পক্ষীরাজের মতো লাফাতে-লাফাতে ডেক্‌ময় ছুটোছুটি করতে-করতে একে-একে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে চম্পট দিলে।

আমাকে না-জানিয়ে বন্ধুরা সবাই হয় মাছের মতো, নয় পাখীর মতো পাখা না-গজিয়ে কেমন করে এই মাঝ-গঙ্গা থেকে সরে পড়লেন, বেঞ্চগুলো আর ডুগ্‌ডুগি দুটো কেন এমন অদ্ভুত কাণ্ড করতে লাগলো—একথা যেমন আমার মনে উদয় হয়েছে অমনি দেখি ষ্টীমারখানা দুপাশে দুটো প্রকাণ্ড ডানা ছড়িয়ে দিয়ে সোজা সেই আকাশ-জোড়া ময়ুর-পুচ্ছের মতো রামধনুকের ফাটকটার দিকে উঠে চল্লো।

জল ছেড়ে শূন্যে খানিক ওঠবার পর দেখছি অবিন উপরতলার সারেঙের কুট্‌রী থেকে উঁকি মেরে আমার দিকে চেয়ে হাস্‌ছে! তার পাশে সেই ময়ূরের পালক-ওয়ালা অদ্ভুত মানুষটা আমাদের! আমি এদের কোনো কথা বলেছিলেম কিনা মনে নেই, উত্তরে একটা খুব গম্ভীর গলায় শুনলেম—"পালকের বাদুঘরে চলেছি,—ময়ুর-পুচ্ছধারীদের সপ্তম স্বর্গে!"

স্বর্গ এবং যাদুঘর এর একটাতেও যাবার মতলবে আমি বাড়ি থেকে রওনা হইনি। তরী আমার বেরিয়েছে জোয়ার ঠেলে; ভাটা কাটিয়ে ঘরে ফিরবো—এই কথাই মনে ছিল। কাজেই আমি খুব চেঁচিয়ে বল্লেম—"জাহাজ ভেড়াও, আমি নামতে চাই।" কিন্তু জাহাজ তখন তার তরণী-রূপ ছেড়ে পাগ্‌লা পক্ষীরাজ হয়েছে। আর চালাচ্ছেন তাকে সেই পালকধারী! কাজেই কোনো ঘাটেই যে সে না-দাঁড়িয়ে বরাবর রামধনুকের মটকায় গিয়ে হ্রেষাধ্বনি করে হঠাৎ থামবে তার আর বিচিত্র কি!

তিনটেতে আমরা পক্ষীরাজের পিঠ থেকে জ্বলন্ত উল্কার মতো কেন যে এতক্ষণ মহাশূন্যে ঠিক্‌রে পড়িনি, এইটেই আশ্চর্য্য! ময়ূরের পালকের ডগায় মাছি যেমন, তিনটিতে আমরা তেমনি সাতরঙের একটু কিনারা প্রাণপণে আঁকড়ে শূন্যে ঝুলছি, এমন সময় আমাদের পাণ্ডা—সেই ময়ূরপুচ্ছধারী মানুষ-দাঁড়কাক রামধনুর ডগায় স্থির হয়ে বসে আঙুল বাড়িয়ে দেখালেন। সেখানে কি আশ্চর্য্য পাখীরাই ঘুরে বেড়াচ্ছে! রঙিন পালকের আলোতে সে-দিকটা কখনো দেখাচ্ছে জ্যোৎস্নার মতো নীল, কখনো সকালের আকাশের মতো সোনালী, সন্ধ্যার আকাশের মতো রাঙা, জলের মতো ঝক্‌ঝকে রূপালী, ধানের ক্ষেতের মতো ঠাণ্ডা সবুজ। এই বা নতুন পাতার মতো টাট্‌কা, এই ঝরা পাতার মতো মলিন। রঙের খেলার সেখানে অন্ত নেই। তারি মধ্যে খেলে বেড়াচ্ছে একদল শিশু, পাখীর ঝরা-পালক উড়িয়ে-উড়িয়ে ছড়াছড়ি করে—

তপোবনের শকুন্তলার মতো। আমি অবিনের গা টিপে বল্লেম—“ওহে, এরাই হচ্ছে পরী।”

পাণ্ডা একটু হেসে বল্লেন—“আজ্ঞে না। এরা হলো রামধনুকের প্রাণ। এরা আছে বলেই রামধনুকে রং আছে। পরী দেখতে চান্ তো ঐ দিকটায়—যে দিকটায় পালকের যাদুঘর—যেখানে পালকের দাম আছে।”—এই বলে তিনি দক্ষিণে—প্রায় দক্ষিণ-দুয়ারের কাছাকাছি একটা জায়গা দেখিয়ে বল্লেন—“ওই যে দেখছেন দুখানা ডানা বেঁধে হাত-দুটি বুকে রেখে, ওঁরা হলেন মানুষ, কেবল ডানার খাতিরে আমরা বলি ওঁদের এন্‌জেল্ ;—আর-কোনা তফাৎ মানুষের সঙ্গে নেই। আর ঐ দেখুন গরুড়কে। শুধু ডানা নয়, পাখীর ঠোঁটটা পর্য্যন্ত মুখোস কোরে পোরে দাস্য-রসের রাজসিংহাসন আপনার রামা-চাকরের হাত থেকে বেদখল করে নিয়ে বসে আছেন। ওই ঠোঁট আর ডানা বাদ দিলে উনি মানুষমাত্র। আর ওই দেখুন বৃন্দাবনের শুক-সারি। এঁদের রাজা গরুড় তবু প্রভুর সেবার জন্যে মানুষের হাত-দুখানা রেখেছেন ; কিন্তু এই গরুড়ের চেলা—সেবাদাস সেবাদাসীগুলি নিজেদের টিয়াপাখীর খোলসে সম্পূর্ণ মুড়ে ফেলে আসলটাকে একেবারেই গোপন কোরে দিব্যি সুখে বিচরণ করছে। মানুষ যখন পালকের শিল্পে খুব বিচক্ষণ হয়ে ওঠেনি—অর্থাৎ তাদের গোঁজা পালক ও পাখনা সহজেই লোকের কাছে ধরা পড়তো—এরা তখনকার জীবের আদর্শ। এ অংশটাকে যাদুঘরের পুরানো অংশ বলা যায়।

এর পরেই ওদিকে ঐতিহাসিক যুগের জীবগুলো। ক্রুজেডারদের মতো পালক তারা কেবল মাথায় ঝুঁটিতে রেখেছে, বাকি সমস্ত-দেহ লোহার সাঁজোয়া দিয়ে অনেকটা পাখীর ধরণে নিজেদের সাজিয়েছে। এইসময় থেকে ডানার চাল উঠে গিয়ে পালকের ঝুঁটি বাহাদুর-লোকমাত্রেরই মধ্যে ফ্যাসন হয়ে উঠলো। টুপিতে, পাগড়ীতে, মুকুটে, ঘোড়ার মাথায় পালক-গোঁজার যুগ এটা! ময়ূরের পালক, বকের পালক, কাকের পালক, চিলের পালক,—উটপাখী, ঘোড়াপাখী, সবার পুচ্ছ এরা বহন করেছে,—নিজেদের পুচ্ছ খসিয়ে রেখে। তার পর আধুনিক যুগের জীব দেখ। এখানে একদল শিরে-পুচ্ছ দেখা যায়; একদল দেখা যায় পালকের কলম-পেশা; আর-একদল সম্পূর্ণ পালক গোপন কোরে পালক-ধারীর রাজা হয়ে কেবল পালকের রং—গেরুয়া সাদা কালো ইত্যাদি গায়ে মেখে রাজত্ব করছে—কেউ আদালতে, কেউ বিদ্যা-লয়ে, কেউ ছাপাখানায়, কেউ ডাক্তারখানায়—প্রকাণ্ড পালক-ধারীদের কন্‌গ্রেসে কন্‌ফারেন্সে স্ব-স্ব-দেশে। এর পরে যে-যুগ আসবে তার সোনার ডিম পালকের গদীর উত্তাপে এখনো সিদ্ধ হচ্ছে। এই ডিম ফুটে যে বার হবে, তার পালক পিঁপড়ের পিঠের দুখানি ডানার মতো হঠাৎ গজাবে—এইরূপই পণ্ডিতরা বলেন। আর সেই অদ্ভুত জীবের জন্মদিনের 'শোকোচ্ছ্বাস গাথা' লেখবার জন্যে ময়ূ-রের ডানার গেরুয়া রঙের পালকের কলমটা কাণে গুঁজে যে আসবে তার স্মৃতিসভার বিজ্ঞাপন এখন হতে বিলি আরম্ভ হয়েছে দেখ।"

বড়-বড় শিল, পালক, ধুলো-বালি মুঠো-মুঠো ঝুড়িঝুড়ি আমাদের মাথায় মুখে-চোখে পড়ছে। রামধনুক আঁকড়ে আর থাকা চলে না। এরি মধ্যেই তার সাত-রং ফিকে হতে সুরু হয়েছে—সম্পূর্ণ গলতে সাত-সেকেণ্ডও লাগবে না। এই ঝড়ের মুখে অবিন তার পালক-ছাপা কোটের বোতাম এঁটে, পাণ্ডাজী তাঁর ময়ূর-পালকের চামর বাগিয়ে, উড়ে-পড়বার জোগাড় কচ্ছে দেখে আমি বল্লেম—"ওহে আমার উপায়? আমার ত পালক নেই। আছে মাত্র গায়ে এই কাশ্মীরের 'পরীতোষ' শাল। এর নাম পরী বটে কিন্তু এর পালক মোটেই নেই! একে নিয়ে তো ওড়া চলবে না?"

"খুব চলবে। ওকে বুঝি বলে পরীতোষ? ওর ফার্সি নাম হচ্ছে পর্‌-ঈ-তাউস্‌। ময়ূরের পেখমের গোড়াতে যে ছাই-রঙের নরম পালক লুকোনো থাকে, তাই দিয়ে এটা প্রস্তুত। বাদশারা তক্ত-তাউসে এই শালের বিছানা লাগাতেন; এখন আমরা গায়ে দিয়ে থাকি। ভয় নেই, উড়ে পড়।"

মাথা-থেকে-পা-পর্য্যন্ত শালখানা মুড়ি দিয়ে রামধনুকের মট্‌কা থেকে ঝুপ করে' আবার যে-জাহাজ সেই-জাহাজেই নেমে পড়লেম। চোখ খুলে দেখলেম যেখানকার সেইখানেই আছি—পূর্ব্বের মতো শ্রীঅবনীন্দ্র। রামধনুক আর পক্ষীরাজের সঙ্গে অবিনটা পালিয়েছে।

ছাইভস্ম

সবাই বলছে সেটা হাঙর, কিন্তু আমি বলছি—"না, না, না!" বালি-উত্তরপাড়ার ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় জেলেদের জালে এই যে-জিনিষটা ধরা পড়েছে তা আমাদের জাহাজের লেট্-শুশুক-সভার অধিষ্ঠাত্রী-দেবতার বাহন—জীবন-শূন্য শুশুকের খালি মোখোক বই আর-কিছু হতেই পারে না। সুতরাং আমাদের উচিত ছিল ভূতপূর্ব্ব সব সভ্য মিলে খুব ঘটা-কোরে লেট্ সভার শ্রাদ্ধ করা। গঙ্গায় তখন তপ্সী মাছ যথেষ্ট পাওয়া যাচ্ছিল, এবং আমাদের মুখুয্যেমশায় আমার খাতিরে ও শুশুকের প্রেতাত্মার প্রীত্যর্থে ভোজের দিনে বালি-উত্তরপাড়ায় যতরকম পটোল বাজারে আসে ও ক্ষেতে জন্মায় সব তুলে নেবার জন্যে কোমর-বেঁধে প্রস্তুত ছিলেন; কিন্তু আমার সে-প্রস্তাবটা কেউ গ্রাহ্যই কল্লেন না। আমাদের লেট্-সভার সদ্গতি হল না;—উৎপাত সুরু হল—জলে-স্থলে সভার সভ্যদের উপরে; দেশে-বিদেশে আমাদের কজনের উপরে উৎপাত সুরু হল! হৃষীকেশে দু'জন সাহেব, কোথাও কিছু নেই, খামকা দুটো রুই কাৎলা ছিপে ধরে মৎস্যহিংসা কোরে বসলো। এতে শুশুক-সভার সমস্ত হিঁদুসভ্য বিষম ব্যথা পেলেন। এদিকে আবার আমাদের বাঁড়ুয্যেমশায় কুটিঘাটা থেকে উত্তরপাড়া

পর্য্যন্ত বেড়া-জাল ফেলেও আর তপ্‌সী মাছ গ্রেফ্‌তার করতে পাল্লেন না। সমুদ্র ছেড়ে গঙ্গার খালে তপস্যা করতে আসাটা যে মূর্খের মতো কাজ হয়েছে এটা তাদের কে যে বলে দিলে তা জানা গেল না।

তারপর, উত্তরপাড়ার মালিনীকে আমাদের মুখুয্যে অভি-সম্পাতের ভয় দেখিয়েও তাঁর জন্যে নিত্য পটোল তুলতে রাজি কর্ত্তে পারলেন না। নিমতলার অবিনাশবাবু আমার ছেলে-বেলার বন্ধু হয়েও আমার নামে মানহানির মকদ্দমা আনবার ফন্দি আঁটতে লাগলেন। অজুহাত যে আমি 'ভারতী'তে ইদানিং যে-গল্পগুলো অবিন নাম দিয়ে লিখছি, সেগুলো তাঁকেই উদ্দেশ কোরে গালাগালি দেবার মতলোবে ছাপানো। অবিন যে 'অবনী'রই সূক্ষ্মশরীর, আর মুখে ছাড়া লিখে গালাগালি ও লিখে ছাড়া হাতে মারামারি যে আমার দ্বারা একেবারেই সম্ভব নয় এটা আমি কিছুতেই অবি-নাশবাবুকে বোঝাতে পাচ্ছিনে।

শেষে, এই মাসে ঘোড়ালাভ আমার কুষ্টিতে পষ্ট-কোরে লেখা রয়েছে। আমাদের লীলানন্দ স্বামীজীও বল্লেন এবারের ডার্বিতে জুয়াখেলার টাকাটা কাগজের দুখানা ডানা মেলে পক্ষীরাজের মতো আমারি দিকে আস্‌ছে। কিন্তু এ সত্বেও আমার অশ্বমেধ পশু করে ঘোড়াটা পথ-ভুলে অন্যের আস্তাবলে গিয়ে ঢুক্‌লো!

এই সব উৎপাত দেখে আমার মন একেবারে উদাস হয়ে গেল। আমি অবিনকে কিছু না বলে-কয়ে জাহাজ ছেড়ে একে-

বারে নৈমিষারণ্যের দিকে বেরিয়ে পড়লেম—"বিফল জনম, বিফল জীবন।"—একতারাতে এই গান গাইতে-গাইতে। ঘোড়দৌড়ের ঘোড়াটা কিম্বা তার ডানার একটুকরো কাগজও যদি তখন—যাক্ সে দুঃখের কথায় আর কাজ নেই।

কাশীর দশাশ্বমেধের ঘাটে সবে ডুবটি দিয়ে উঠেছি, এমন সময় এক সন্ন্যাসী এসে হাত ধরে বল্লেন—"ব্যাস্ করো বেটা, চলো হর-দোয়ারমে কুম্ভকা অস্নান্ করেঙ্গে।" কি জানি সন্ন্যাসীঠাকুরের কি শক্তি ছিল, আমি জড়ভরতের মতো জল থেকে উঠে তাঁকে প্রণাম করে পায়ের ধূলো নিতে গিয়ে দেখি পায়ে ধূলো নেই! আমি তখনি বুঝলেম ঠিক-লোক পেয়েছি। একেবারে তাঁর পা জড়িয়ে বল্লেম—"ছলনা করছ ঠাকুর? এখান থেকে হরিদ্বার একদিন-এক-রাত্তিরের পথ; আর পাঁজিতে লিখছে আজ একটা-উনপঞ্চাশে হল কুম্ভ!" সন্ন্যাসী হেসে বল্লেন—"বেটা, কুম্ভকা অর্থ ক্যা আগে তো সমঝ লেও!"

ঘাট থেকে সন্ন্যাসীর আস্তানা—মণিকর্ণিকার শ্মশান—বেশীদূর হবে না; কিন্তু ঐটুকুর মধ্যে ঘটাকাশ যে অর্থে ভরা—পূর্ণকুম্ভর ঘড়ার মতো শুধু গঙ্গাজলে ভরা নয়—সেটা ঠাকুর যেন চোখে-আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন। যিনি ঘটাকাশ এক-নিমেষে অর্থে ভরিয়ে দিতে পারেন, আকাশকুসুমের মতো দেখালেও ডার্বি খেলার ঘড়াভরা অর্থলাভের সদুপায় যে তাঁরি দ্বারা হতে পারবে—আর কারু দ্বারা নয়—এটা আমার বিশ্বাস হলো। আমি ভক্তি-

ভরে গদগদভাবে বাবার ঠিক পিছনে-পিছনে চল্লেম। কাগজের অর্থ নয়, রূপেয়া-ভরা কুম্ভও নয়, চক্‌চকে আকবরি-মোহরের ঢাকাই-জালা তখন আমার যেন চোখের সাম্‌নে উদয় হয়েছেন, এম্‌নি বোধ হতে লাগলো। আমি বাবাকে নির্জ্জনে আপনার মনের দুঃখু জানাবার জন্যে ব্যাকুল হয়েছি, বাবা বোধ হয় এটা আগে-থাকতেই জানতে পেরেছিলেন, তাই আজ আমার ধৈর্য্য পরীক্ষা করবার জন্যেই যেন তিনি প্রায় বারোটা পর্য্যন্ত কাশীর বাঙালিটোলার অলিতে-গলিতে ঘিউ আর আটা ভিক্ষে করে বেড়াতে লাগলেন। কিন্তু আমি জেনেছিলেম যে এবার ঠিক-লোকের নাগাল পেয়েছি। সোনা-করবার ভস্ম, গাছ-চালাবার মন্ত্র—এম্‌নি-একটা-কিছু এবার আর না-হয়ে যায় না। কাজেই ক্ষিদেতে তেষ্টাতে ভিতরটা আমার শুকিয়ে উঠলেও আমার চোখকে আমি একটুও শুকতে দিলেম না ;—প্রেমাশ্রুতে বেশ-করে ভিজিয়ে রেখে দিলেম।

যখন আশ্রমের দরজায়, তখন বাবা একবার আমার দিকে কটাক্ষ করে বল্লেন—"আউর ক্যা ? কুম্ভ আউর উস্‌কা অর্থ তো মিল্ গিয়া। আভি ঘর যাও।" এখনো পরীক্ষা ! ভাঁড়ার ঘরের দরজার কাছে এনে বলা হচ্ছে ঘরে গিয়ে ভাত খাওগে ! আমি খুব জোরের সঙ্গে বল্লেম—"বাবা, অমন অর্থে আমার প্রয়োজন নেই। আমি এইখেনে পড়ে রইলুম ; কৃপা করতে ইহবে। বাবার কাছ থেকে কিছু চীজ না নিয়ে আমি নড়ছিনে। প্রাণ যায়, সেও স্বীকার !" বাবা আমার কথায় আর-কোনো জবাব না দিয়ে

আটা আর ঘি মেখে রুটি-সেঁকতে বসে গেলেন। আমার দিকে আর দৃক্‌পাতও কল্লেন না।

দুপুরের রোদে আমি একলা মুখ-শুকিয়ে এক গাছের তলায় বসে আছি, এমন সময় ঠাকুর আমার দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে বল্লেন—"বাবা, তোমার কাছে কিছু টাকা-কড়ি আছে?" কি আশ্চর্য্য! একেবারে বাংলা কথা, টান-টোন সব বাঙালির মতো, কিচ্ছু বোঝার যো নেই যে তিনি পশ্চিমের খোট্টা! "পয়সা থাকলে কি আমার এমন দশা হয় বাবা!"—বলেই আমি চোখ-মুছ্‌তে থাকলেম। বাবাজী তখন আমাকে কাছে বসিয়ে, পিঠে হাত বোলাতে-বোলাতে বল্লেন—"তাতে আর দুঃখু কি! আমি বুঝেছি,তোমাকে এই কুম্ভমেলার দিনে একলা দশাশ্বমেধে ডুব দিতে দেখেই আমি বুঝেছি—থার্ডক্লাসের ভাড়াটা পর্য্যন্ত তোমার অভাব। তা কেঁদোনা বাবা, আমি এখনি তোমাকে কুম্ভস্থলে পাঠাব। এই ঘটিটায় ইঁদারা থেকে একটু জল আনো তো।"

আমার তখনো মোহ কাটেনি। হরিদ্বারে কুম্ভস্নান আমার পক্ষে কেমন-কোরে সম্ভব হয়, যখন কাশীতে বসে আমি দেখতে পাচ্ছি হিন্দু ইউনিভারসিটির ঘড়ির কাঁটা একটা-উনপঞ্চাশে পৌঁচেছে প্রায়! যেমন এইকথা মনে করা, অমনি বাবা তাঁর বাঁ-হাতের কড়ে-আঙুলটি আমার কপালে ঠেকিয়ে দিলেন। ব্যস্, একেবারে হরিদ্বারে উপস্থিত! সেই পিতলের লোটাটি পর্য্যন্ত আমার হাতে-হাতে হরিদ্বারে এসে হাজির, অবশ্য হরিদ্বার আমি

এর পূর্ব্বে দেখিনি ; কিন্তু বাবাকে দেখে যেমন বুঝেছিলেম ঠিক-লোকটি পেয়েছি, এবারেও তেমনি বুঝলেম ঠিক-জায়গাটিতে এসে পৌঁচেছি। শুধু তাই নয়, মনে হ'ল যেন এইখানে আমি অনেক-দিনই এসেছি ; আর-পাঁচজনের মতো আমিও আজ এক-কোমর বরফ-জলে দাঁড়িয়ে গঙ্গার স্তব আওড়াচ্ছি আর থেকে-থেকে ডুব দিচ্চি। চারিদিকের লোকজন, পাহাড়পর্ব্বত, মন্দিরঘাট সত্যির চেয়ে বেশী সত্যি হয়ে যেন আমার চোখে পড়তে লাগলো। এক রাজা হাতি-ঘোড়া লোক-লস্কর আর বন্ধ দু'তিনখানা পাল্কিসুদ্ধ আমার পাশে স্নানে নামলেন। পবিত্র জলের পরশ পেয়ে কাঠের পাল্কিগুলো বুঝি সোনার পাল্কি হয়ে যায়, আর হাতি-ঘোড়াগুলো বুঝিবা রাজা-রাজড়া হয়ে দেখা দেয়—এই ভেবে আমি সেদিকে চেয়ে আছি এমন-সময় একটা মোটা-পেট পুলিশম্যান্ পিছন-থেকে আমাকে ধমক দিয়ে বল্লে—"এ বাবু, ক্যা দেখ্‌তা? ভাগো হিঁয়াসে।"

আমি পুলিশের ভয়ে তাড়াতাড়ি একটা কুল্‌কুচি করে যেমন উঠে দাঁড়িয়েছি অমনি চারিদিক থেকে যেখানকার যত পাণ্ডা "হাঁ—হাঁ কল্লে কি! গঙ্গায় কুল্‌কুচি কল্লে! সবার স্নান মাটি হল!"—বলে তাদের নামাবলীর পাগ্‌ড়িতে আমায় পিছুমোড়া করে বেঁধে কিল-চাপড় মেরে আমায় আধ-মরা কোরে একটা অন্ধকার ঘরে টেনে ফেলে দিলে। তারপর কি হলো জানিনে, কতক্ষণই বা অজ্ঞান ছিলেম বলা যায় না, কিন্তু খানিক পরে চোখ-

-চেয়ে গায়ের ধুলো ঝাড়তে গিয়ে দেখি আমি কাশীতে। বল্লে বিশ্বাস যাবেনা, আমার গা কিন্তু তখনো ভিজে ছিল, যেন সেইমাত্র স্নান করে উঠেছি! কাশীর :হিন্দু-কালেজের ঘড়িতে তখন ঢং ঢং করে দুটো বাজলো। একটা উনপঞ্চাশ থেকে দুটো, এরি মধ্যে হরিদ্বারে গিয়ে কুম্ভস্নান, রাজদর্শন, কুল্‌কুচি, মার-খাওয়া এবং পুনরায় কাশীতে ফিরে-আসা—সমস্তটা স্বপ্নে দেখতে গেলেও এর চেয়ে ঢের সময় লাগতো যে! বাবা আমার গায়ে হাত-বুলিয়ে বল্লেন—"বেটা, কুছ চোট লাগা?" আমি একেবারে গদগদস্বরে বল্লেম—"চোট লাগবে বাবা! আপনার কৃপায় একটি আঁচড়, কি একটি দাগ পর্য্যন্ত নেই দেখুন।"

এবারে আমি খুব শক্ত-করে বাবার পা ধরে রইলেম। এত শক্ত যে আমাকে ছাড়িয়ে বাবার আর এক-পাও নড়বার সাধ্য রইল না। ওঁর কাছে কিছু আদায় করে নেবো এই প্রতিজ্ঞা! আমার সম্বলের মধ্যে তখন বাঙালিটোলার বাসাবাড়ীখানি। আমি যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করেও ভাড়াটেদের সেখান থেকে উঠিয়ে দিয়ে বাবাকে এনে সেইখানে বসালেম। তেতলায় একখানা ছোট ঘর, তারি সাম্‌নে একটু ছাদ। সেইখানে গুরুদেবের উপদেশ-মতো আমি যোগাসন, প্রাণায়াম উৎসাহের সঙ্গে সুরু করে দিলেম। ফৌজের জমাদার, হাবেলদার, কাপ্তান, কমাঁদা—সবার যেমন রকম-রকম পোষাক, ইউনিভারসিটির নানা ডিগ্রীর যেমন রং-বেরঙের ঘাঘরা, তেমনি সন্ন্যাসীদের দলেও সিদ্ধির তারতম্য হিসেবে

রকম-রকম গেরুয়া আর রকম-রকম ফ্যাসনের কৌপিন, পাগ্‌ড়ি জটা, তিলকের সাজসজ্জা আছে। আমি তথন যোগ-সাধনের ইন্‌ফেণ্ট ক্লাসে বা ইন্‌ফেন্‌ট্রি দলে সবে ভর্ত্তি হয়েছি। কাজেই আমার উর্দ্দিটা হল সাদা লুঙ্গী, সাদা পাঞ্জাবি-কোর্ত্তা, মাথায় সাদা পাগ্‌ লম্বা ল্যাজ আর সেই ল্যাজের গোড়াতে একটুখানি গেরুয়া পাড়; হাতে বাঁশের ছড়ি, পায়ে খড়ম, গলায় তেঁতুল-বিচির মালা; কপালে ছাই। সারা পাগড়ি-কোর্ত্তা-লুঙ্গী গেরুয়া হয়ে শেষে খালি গায়ের চামড়ায় গিয়ে পৌঁছোতে আমার অনেক বাকি। আমার যিনি গুরু, তিনিও অতদূর এখনো অগ্রসর হতে পারেন-নি। কিন্তু তাই বলে হতাশ হলে চলবে না। বাবার উপদেশ-মতো খুব উৎসাহের সঙ্গে সবটা গেরুয়া উর্দ্দি যত শীঘ্র পারি লাভ করবার চেষ্টা করতে লাগলুম। ওদিকে বাবার সেবা করতে, সন্ন্যাসী খাওয়াতে, তীর্থ সারতে আমার জেবের সব গিনি-সোনা এক-মোড়ক হরিতাল-ভস্মে ক্রমে পরিণত হয়েছে। আমার হাতে সেই ভস্মটুকু দিয়ে বাবা বল্লেন—"যাও বাবা, এখন সংসারে ফিরে যাও, সেখানে তোমার অনেক কাজ বাকি রয়েছে।" আফিসের কাজ, ঘরের কাজ, বাইরের কাজ, অনেক কাজই বাকি রেখে চলে এসেছি। কিন্তু সে যে হল অনেকদিন। কাজগুলো আমার জন্যে এখনো বসে আছে কিনা জানিনে। তাছাড়া হাতে আমার বাকি রয়েছে মাত্র সেই হরিতাল-ভস্মের মোড়ক। সেটাও সত্যি ভস্ম কিনা, তারও পরীক্ষা করতে সাহস হচ্ছে না। অবিনকে তথন একখানা

চিঠি লিখে সব খবর জানাবার ইচ্ছে হ'ল। আমি হরিতাল-ভস্মের মোড়ক বাবার কাছে বাঁধা-রেখে ডাক-টিকিটের জন্যে দুটো পয়সা চাইতে গেলুম। তিনি খুব গম্ভীর হয়ে বল্লেন—"বাবা, আমরা মুক্তির মন্ত্র সাধন করি, কোনো-কিছু বাঁধা রাখা তা আমাদের দ্বারা হতে পারে না। সন্ন্যাসী কি কখনো মহাজন হয় বাবা?"

বাবার মধ্যে মহাজনী যে এতটুকু নেই, তাই দেখে ভক্তিতে আমার বাক্‌রোধ হয়ে গেল। আমি 'বিফল জনম, বিফল জীবন' আর-একবার মনে-মনে গাইতে-গাইতে বাঙালিটোলার গলি পেরিয়েছি, এমন সময় অনেকদিনের পরে অবিনের সঙ্গে দেখা।

সে ঠিক তেমনি আছে;—কোনো বদল হয়নি। কথায়-কথায় জানলুম যে গয়ায় চলেছে—আমাদের জাহাজের সেই লেট্ সভার সঙ্গে-সঙ্গে বাংলার যতরকম সভা আছে ও নেই, ব্রাহ্মণশূদ্র-নির্ব্বিশেষে সব ক'টার পিণ্ডদান করতে। আমারো তখন পিণ্ডি দেবার জন্যে হাত নিস্‌পিস্ করছিল, কিন্তু কার সেটা আয় বলে কাজ নেই।

গাড়িতে উঠে আমি অবিনকে বল্লেম—"ওহে গয়ার সাধু-সন্ন্যাসীদের খুসি করবার মতো কিছু পকেটে এনেছো তো?" অবিন হাতের মোটা লাঠিগাছা দেখিয়ে বল্লে—"যথেষ্ট!"

কাশী থেকে গয়া কত দূরই বা? কিন্তু সময় তো লাগছে অনেকটা!—এই ভাবতে-ভাবতে চলেছি এমন সময় অন্ধকারের মধ্যে একটা ষ্টেশনে গাড়ি থামতেই অবিন চট্ করে আমার হাত

ধরে গাড়ি থেকে নেমে পড়লো। একটা ঝড় হ'য়ে প্ল্যাটফরমের সব আলো নিভে গেছে। অন্ধকারে একটা সাদা মোটর দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ভেঁপু দিচ্ছিল। অবিন আমায় নিয়ে তাতে উঠে বসলো। মোটরখানা কোনো হোটেলের ভেবে আমি অবিনকে বল্লেম—"ওহে, আমার এ-বেশে তো হোটেলে ওঠা সম্ভব হবে না! কোনো ধর্ম্মশালায় গিয়ে থাকলে হয়-না?" অবিন আমার পিঠ-চাপড়ে বল্লে—"ধর্ম্মশালা থেকে অনেকদূরে এসে পড়েছি যে! এখনো বুঝি ওটার মায়া কাটাতে পার-নি?" বল্‌তে বল্‌তে-গাড়ি একটা ব্রীজ পেরিয়ে বাঁ-হাতে মোড় নিয়ে দাঁড়ালো। অবিন গাড়ি খুলে লাফিয়ে পড়লো। আমিও নাম্‌বো, এমন সময় আমার পাগড়ীর ল্যাজটা গেল মোটরের একটা চাবিতে বেধে! ল্যাজের গেরুয়া-অংশ, তার সঙ্গে অনেকটা সাদা ফালিও ভাড়ার উপর বখশিশ-হিসেবে গাড়োয়ানকে দিয়ে আমরা দুই বন্ধুতে নদীর ঘাটে শ্রাদ্ধ আর পিণ্ডদান করতে বসে গেলুম। অনেকগুলো সভা, পিণ্ডি তো কম দিতে হলোনা? সব সারতে ভোর হল। শ্রাদ্ধ সেরে সূর্য্যের প্রণাম করতে গিয়ে দেখি আমাদের বড়বাজারের শ্রাদ্ধ-ঘাটে বসে আছি। সেই সিঁড়ি, সেই মার্ব্বেল-পাথর-মোড়া ঘরে তেমনি মিন্‌টান্:টালির বাহার। আমি তো অবাক্! সন্দেহ হলো যে হরিদ্বার-যাত্রাটার মতো এ-যাত্রাটাও বুঝিবা অতিশয় সত্যি!

অবিনের দিকে চাইলেম, তারও চেহারাটা কেমন

ঝাপ্‌সা বোধ হল,—যেন কুয়াশার মধ্যে দিয়ে তাকে দেখছি! কুয়াশাটা আমার মাথার ভিতরে, কি বাইরে জমা হয়েছে সেটা বুঝতে না পেরে আমি কাপড়-ছেড়ে ব্রহ্মতেলোয় হাত বোলাচ্ছি এমন সময় আমাদের জাহাজের বাবাজী এসে আমার সামনে "জয় সত্যনারাণ!" বলে হাত পাতলেন। আমি তাঁকে সত্যিই যোলআনার এক-আনা দেব বলে জেবে হাত দিতেই আমার হাতে ঠেকল সত্যি-নারাণের কোনো কাজেই যেটা লাগবে না হরিতাল-ভস্মের সেই মোড়ক—যেটা অবিনের চেয়ে, হরিদ্বারের চেয়ে, কাশী-গয়া, কলকাতার মোটরগাড়ি, শ্রাদ্ধের মন্তর, বাবাজী, এমন কি আমার নিজের চেয়েও সত্যি, সত্যি, সত্যি;—সত্যি ছাড়া মিথ্যে নয়।

আটটা-উনপঞ্চাশের জাহাজ বাঁশী বাজিয়ে পণ্টুনে লাগল। অবিন, আমি, বাবাজী এবং আরো প্রায় জন-পঞ্চাশ গিয়ে জাহাজের কেউ প্রথম, কেউ দ্বিতীয়, কেউ তৃতীয় শ্রেণী, কেউ-বা কোনো শ্রেণীই নয় দখল কল্লেম।

লুকিবিদ্যে

টিকটিকি, গীরগিটি, মশা, মাছি, ঘুঘু, গায়ে-পড়া-আলাপী, ঘাড়ে-চড়া-বন্ধু,—এক-কথায় সমস্ত পরকীয়া-সাধকদের দলের কাছ থেকে আপনাকে সম্পূর্ণ লুকিয়ে রাখা চলে এমন লুকিবিদ্যেটা আংটি কোরে কর্তা আঙুলে জড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন শুনে আমাদের কৌতূহলের সীমা রইল না। আমরা আংটির কেচ্ছা শোনবার জন্যে কর্তাকে চেপে ধরলেম। কোন্ সূত্রে, কোন্‌খান থেকে, আংটিটা তাঁর আঙুলের গাঁটে এসে যে আট্‌কে রইল, সেটা জানাতে কর্তা নারাজ। কাজেই কাণ্ডের আদিপর্ব্বের শেষ থেকে তিনি আরম্ভ করলেন—

"অন্যের দেশালাইয়ের বাক্স যেমন কোরে অজান্তে সময়ে-অসময়ে আমাদের পকেটে থেকে যায়, তেমনি কোরে রাং এবং সীসা এই দুই ধাতু দিয়ে গড়া লুকিবিদ্যের এ-আংটি হাতে নিয়ে সুন্দরবনের অঘোর-পন্থীদের আড্ডা ছেড়ে হাঁটা-পথে অনেক ঘুরতে-ঘুরতে শেষে আমি তমলুকে এসে হাজির। তমলুক খুব একটা ভারি সহর। সেখানে আমি একবার ছেলেবেলায় আমার বড়মামার সঙ্গে গিয়েছিলুম। মামা তখন ফ্রুক্স্ কোম্পানির মুচ্ছুদ্দি। সাহেবটা যে পাজি ছিল, তা আর কি বলবো! একবার এক কেরাণী তার কাছে বাপ মরে বোলে ছুটি চাইতে সে বল্লে কিনা—"ইয়োর ফাদার

হেজ্ নো বিজ্‌নেস টু ডাই হোয়েন্ বজেট প্রেসার ইজ গোয়িং অন্!" দেখো-দেখি, বাপ্ মরে, তাকে কিনা এই কথা! সেকালের সাহেব দু'একটা ভালোও ছিলো। টুনি—সে বড় মজার সাহেব ছিল। ধুতি পোরে সে কালীপূজোর যাত্রা শুনতে যেত। তার পাখী শিকারে ভারি সখ। সেটার এক রোগ ছিল এই যে পাখীটাকে মেরেই আগে তার ল্যাজটা কেটে নেবে! সেইজন্য তার নামই হয়ে গিয়েছিল ল্যাজকাটা-টুন্‌টুনি। সে প্রথম আসে ১৮৩৫ সালে ফৌজের ডাক্তার হয়ে। তারপর মিউটিনির কিছু-আগে একটা নীলকরের মেয়েকে বিয়ে কোরে কোন্ বড় মিলিটারি পোষ্টে বহাল হয়ে সাংহাই চলে যায়। সেইখেনে বসে লোকটা সাংহাই টু ইণ্ডিয়া একটা রেল খোলবার প্ল্যান হোম গর্ভমেণ্টকে পাঠায়। তখন চীনে মিস্ত্রী আসতো জাহাজে কোরে, আমরা দেখেছি।—ঐ বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীটের দুধারে জুতোওয়ালা। সন্ধ্যাবেলা ছুরি-হাতে তারা ঘুরে বেড়াতো। যত সেলার আর চীনের আড্ডা ছিল ওই থানটায়! ব্যাটারা যে জুতো বানাতো বাপু, তেমন জুতো এখন পাওয়াই যায় না। ওই 'আচীন্'—ওর অনেক দিনের দোকান। আমার জ্যাঠার মামাশ্বশুর—তিনি ওই দোকান থেকে জুতো নিতেন। সেকালে তাঁর মতো সৌখিন ছিলনা। ওই যেখানটায় এখন রিপন্ কালেজ হয়েছে, ওইটে ছিল তাঁর বৈঠক-খানা। তাঁর বাগানে একটা সাদা চাঁপার গাছ ছিল; তাই থেকে ও-পাড়াটার নাম হয়েছিল চাঁপাতলা। শুনেছি সেই চাঁপাফুলে তাঁর

দোলমঞ্চ সাজানো হতো! দেলোয়ার খাঁর নাম শুনেছো তো?—ওই তাঁরি ওস্তাদ; তাঁর কাছে চাকর ছিল। ওই মিস্‌নারিরা ছিরামপুরের তাঁর বাগানখানা কিনে প্রথম ছাপাখানা বসায়। তখন সব কাঠের টাইপ্‌। রামধন বলে এক ব্যাটা যে কারিকর ছিল, তার মতো পরিস্কার অক্ষর কাটতে কেউ পারতো না বাপু! তার বংশের একটা ছোঁড়া এখন আমাদের পাড়ায় ওষুধের দোকান কোরে ডাক্তার হয়ে বসেছে। সবপ্রথম এদেশে বিলিতি ওষুধের ডাক্তারখানা খোলেন আমাদের নাকাসি-পাড়ার শ্যাম-ডাক্তার। সাহেবরা তাঁর ওষুধ ছাড়া খেত না। কবিরাজগুলো কিন্তু তাতে বড় চটে ছিল—চটবারই কথা!"

আমরাও কর্ত্তার গল্পের বহর দেখে যে না-চটেছিলুম তা নয়। কথাটা আংটি থেকে কবিরাজি শাস্ত্র, সেখান থেকে ইংলণ্ডের ইতিহাস, মামাশ্বশুরের রূপবর্ণন, মিস্‌নারিদের জুয়োচুরি, ব্রাহ্মদের ভণ্ডামো, চৈতন্যদেবের কয় পার্ষদের সঠিক জীবন-বৃত্তান্তে এসে পৌছল। তারপর বুদ্ধের দাঁতের হিসেব থেকে ক্রমে যখন রাসমণির মন্দির যে-মিস্ত্রি বানিয়েছিল সে যে হিন্দু নয়—মুসলমান; এবং তার নাতির নাতি এখন পোর্ট-কমিশনারের এই জাহাজের খালাসী হয়েছে—এই রকম একটা জটিল সমস্যাতে এসে পড়লো, তখন আমাদের জাহাজ প্রায় বড়বাজার পৌচেছে! আমি অবিনের গা-টিপে বল্লেম,—"ওহে লুকিবিদ্যেটা কি লুকিয়েই থাকবে? আংটিটার তো কোনো সন্ধান পাচ্ছিনে!"

"তার পর আংটিটার কি হলো কর্তা ?"—বলেই অবিন চোখ বুজ্‌লে। গল্প চল্লো—

"লুকিবিদ্যে বড় সহজ বিদ্যে নয়। রাজা কেষ্টচন্দরের সভায় নবরত্নের এক রত্ন রসসাগর, তিনি লুকিবিদ্যে জানতেন। লর্ড ক্লাইবের জীবন-চরিতে এই রসসাগরের লুকিবিদ্যের কথা লেখা আছে—"

লর্ড ক্লাইব থেকে ফোর্ট উইলিয়াম, সেখান থেকে ব্ল্যাক হোল ও সমস্ত বাংলার ইতিহাসের গোলকধাঁধায় ঘুরতে-ঘুরতে গল্প ক্রমে রুমের বাদশার কত টাকা, রামমোহন সাহা কি দিয়ে ভাত খেতেন —এমনি সব ঘরাও খবর আবিষ্কার করতে-করতে বড়বাজারের পণ্টুনের দিকে ক্রমেই এগিয়ে চল্লো ;—আংটির দিক দিয়েও গেলনা ! কর্তার শেষ-বক্তব্য দেশের এক নমস্য ব্যক্তির নামে একটা কুৎসা। ভদ্রলোকটির খুব আত্মীয়রাও যে-খবর ঘুণাক্ষরে জানেনা, এমন একটা গোপনীয় সংবাদ চুপিচুপি জাহাজের সকলকে জানিয়ে এবং কাউকে বলতে মানা কোরে দিয়ে কর্তা ডাঙায় পা দিলেন।

আমি অবিনকে বল্লেম—"ওহে, যথার্থই কর্তা লুকিবিদ্যে জানেন। গল্পটা কিছুতেই ধরা গেলনা !"

অবিন খুব গম্ভীর হয়ে বল্লে—"আমি ওই জন্যেইতো ওঁর নাম দিয়েছি আবিষ্কর্তা ! নিজের খবর এর কাছে লুকোনো থাকে, আর পরের গোপনীয় খবর আবিস্কৃত হয় এঁর কাছে ওই আংটির

প্রভাবে। পরের ছোটখাটো ব্যবহারের জিনিষ—চুরুট, দেশলাই, পান, মায় তাদের ডিবে এঁর পকেটে আপনি-গিয়ে প্রবেশ করে; পরের লাঠি, ছাতা, বই ইত্যাদির মতো সামগ্রী আপনি-গিয়ে হাতে ওঠে; পরের বিত্তের ইনি পণ্ডিত; পরচর্চ্চায় ইনি অদ্বিতীয় পরকীয়া-সাধক; ইনি পরের যা-কিছু পার করবার কর্ত্তা,—আপনার কেউ নয় অথচ আমারও কেউ নয়।"

গমনাগমন

মিশনারি বন্ধু আমার কোণার্ক যাত্রার নাম শুনিয়াই বিচলিত হইয়া উঠিলেন; এবং কিঞ্চিৎ মুখভঙ্গীসহকারে বলিয়া উঠিলেন —"সে স্থানে-কি দর্শনীয় আছে!" মিশনারিটি সেই ধরণের লোক, গির্জ্জা তুলিয়া যাঁহারা জগবন্ধুর মন্দির দমাইতে উদ্যত, নাচ যাঁহাদের চক্ষুশূল, গান যাঁহাদের কাছে কুরুচি, কদম্বতরু অশ্লীল বৃক্ষ এবং কৃষ্ণলীলা তদপেক্ষা অধিক-কিছু! এরূপ বন্ধুর সহবাসও যে সময়ে-সময়ে আমাদের অরুচিকর হইয়া পড়ে এবং যেটা তাঁহারা দর্শনীয় বলেন না সেটাই আমাদের কাছে আদরণীয় হইয়া থাকে—এটা আমার বন্ধুকে বুঝাইতে সময়ের বৃথা অপব্যয় না করিয়া আমি এবারে সত্যই কোণার্ক যাইবার আয়োজন করিলাম—ঠিক সেইগুলাই দেখিতে, পাদরী সাহেবের মতে যেগুলা মোটেই দর্শনীয় নয়।

বছরকতক পূর্ব্বে আমি "পুরীর পত্রে" শ্রীক্ষেত্র সম্বন্ধে যে-ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছিলাম তাহা সফল হইয়াছে। হোটেলে, মোটরগাড়িতে, বৈদ্যুতিক আলোয় পুরী অন্ধকার হইয়াছে এবং সুরুচিসঙ্গত সাহেবী পিয়ানোবাদ্যের টুং টাং ধ্বনিতে সাগরের কল্লোল চাপা পড়িয়াছে!

সুতরাং মোগলাই-জোব্বার উপরে প্রকাণ্ড একটা সাহেবী সোলা-টুপি চাপাইয়া, একগাছা মোটা লাঠি ও এক লণ্ঠন লইয়া, ছয়-ছয় পাল্কী-বেহারার সঙ্গে একেবারে পূব-মুখে দৌড় দিবার বন্দোবস্ত করিলাম—সুরুচির এবং ভদ্রতার কোনো দোহাই না মানিয়া। কিন্তু যাত্রার পূর্ব্বে মাথার উপরে একখণ্ড মেঘ এমন ঘনাইয়া আসিল যে, মনে হইল, বুঝিবা পাদরী-সাহেবের অভিশাপ ফলিয়া যায়!

আমাদের যাত্রার মুখে মেঘ-কাটিয়া পঞ্চমীর চাঁদ প্রকাশ পাইয়াছে। অদূরে চক্রতীর্থ—বালুকাস্তূপের ধবলতার উপরে, আধুনিক হইতে দূরে, অতীতের একটি মরীচিকার মতো দেখা যাইতেছে।

চক্রতীর্থ পার হইয়া আর আধুনাতনও নাই, পুরাতনও নাই;—রহিয়াছে কেবল চিরন্তন নীরবতা—অন্তহারা অস্ফুটতাকে আলিঙ্গন করিয়া। মানুষের পদশব্দ সেখানে লুপ্ত, সাগরগর্জ্জন স্বপ্নের প্রায়—পাই কি, না পাই। এই শূন্যতা এত বিরাট যে, চাঁদের আলো, সেও সেখানে অন্ধকার ঠেকিতেছে। ছায়ার বৈষম্য

দিয়া আলোকে ফুটাইতে, প্রতিঘাত দিয়া শব্দকে জাগাইতে, সেখানে কিছুই নাই ;—অথচ মনে হয় না যে একা! সঙ্গে ছয়-ছয় বেহারা চলিয়াছে বলিয়া নয় ; কিন্তু এই প্রকাণ্ড শূন্যতা যে নির্জীব নহে, সেটা স্পষ্ট অনুভব করিতেছি বলিয়া। এটা যে শ্মশান নয়, এখানেও যে বিরাট প্রাণের স্পন্দন অবাধে আমার চারিদিকে হিল্লোলিত, তাহা বেশ বুঝিতেছি। স্তব্ধ রাত্রি জুড়িয়া লক্ষকোটি কীটপতঙ্গের ঝিনিঝিনি,—দূরে অদূরে কাহাদের নূপুর-শিঞ্জিনীর মতো তালে-তালে উঠিতেছে পড়িতেছে,—তাহা কানে আসিতেছে না সত্য ; অকূল অন্ধকারের ভিতর দিয়া আমাদের সাড়া পাইয়া হরিণের পাল ছুটিয়া চলিয়াছে,—চোখে পড়িতেছে না বটে ; কিন্তু মন তাহার সহস্র পরিচয় পাইতেছে এবং আপনাকে নিঃসঙ্গ মানিতেছে না! লোকালয়ে নিজেকে অনেক সময়ে একাকী বোধ করিয়াছি, কিন্তু কোণার্ক-যাত্রার প্রথমেই এই যে শিশুর মতো ধরিত্রীর কোলে ঝাঁপাইয়া পড়ার আনন্দ,—নিখিলের সহিত আপনাকে সঙ্গত জানার আনন্দ—ইহাতে প্রাণ যেন দুলিতে থাকে,—মনেই আসে না, একা চলিয়াছি।—চলার আনন্দ! নিখিলের সহিত দুলিয়া চলার আনন্দ! শূন্যের মাঝ দিয়া উড়িয়া চলার আনন্দ! প্রদীপ নিভাইয়া আলোকের কোনো অপেক্ষা না রাখিয়া অন্ধকারের ভিতর দিয়া ভাসিয়া চলার আনন্দ!

চক্রতীর্থ হইতে বালুখাই পর্য্যন্ত সমস্ত পথটা আনন্দের একটা জাগরণের মধ্য দিয়া যেন উড়িয়া আসিয়াছি। এইখানে আসিয়া

প্রাণের দুয়ার সহসা যেন বন্ধ হইয়া গেছে;—মন যেন আপনার দুই ডানা টানিয়া চুপ করিয়া বসিয়াছে। নিশ্চল মেঘে চন্দ্র-তারকা আচ্ছন্ন; নীরব অন্ধকারের মাঝে নিস্তরঙ্গ বায়ুরাশি;—কোনোদিকে সাড়া-শব্দ নাই! মনে হইতেছে এ কোথায় আসিলাম—কোন্ মৃত্যুর দেশে পায়ে-পায়ে অর্দ্ধরাত্রে আমরা এই কয় ক্ষুদ্র প্রাণী! এসময়ে আলোর জন্য, ধ্বনির জন্য, অন্ধকারে কোথাও-একটা-কিছুকে দেখিবার জন্য প্রাণ আকুল হইয়া ওঠে। মন চাহিতেছে চলি, কিন্তু সমস্ত শরীর যেন অসাড় হইয়া গেছে!

লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোটির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, পাল্কীবাহকদের করুণ ক্রন্দন-গান শুনিতে-শুনিতে চলিয়াছি। কোথায় চলিয়াছি, কেমন করিয়া চলিয়াছি, কেনই-বা চলিয়াছি তাহা আর মনে আসিতেছে না;—শুধু বোধ হইতেছে যেন প্রকাণ্ড একটা অন্ধকার গোলকের ভিতর দাঁড়াইয়া, একটি পাও অগ্রসর না হইয়া, আমরা কেবলি তালে-তালে পা ফেলিতেছি—"পহর রাতি, পান বিঁড়িটি! পান বিঁড়িটি, পহর রাতি!"

বালুঘাই পার হইয়া চলিয়াছি। পহর রাতি, পান বিঁড়িটি এবং লণ্ঠনের বাতি, তিনে মিলিয়া মনকে ঘিরিয়া একটা যেন স্বপ্নের সৃজন করিয়াছে। মাঝে-মাঝে এক-একটা তালগাছ অন্ধকারের ভিতর দিয়া হঠাৎ চোখে পড়িয়া আবার কোথায় লুকাইয়া যাইতেছে! চারিদিকে যেন একটা লুকোচুরির খেলা চলিতেছে;—মরীচিকার মায়া দেখা দিতেছে, ঢাকা পড়িতেছে!

কাছে আসিতেছে সকলি—গাছ-পালা, গ্রাম-নদী ; কিন্তু ধরিতে গেলেই সরিয়া পালাইতেছে ;—কিছুই নিরাকৃত হইতে চাহিতেছে না !

দর্শন আকর্ষন এবং নিরাকরণ—এ তিনের অভাবের মধ্যে 'নিয়াখিয়া'-নদীটি শীতল স্পর্শে আমাদের সমস্ত জড়তা দূর করিয়া আপনার স্বচ্ছ হাসির কল্লোলে যখন চকিতের মতো রাত্রির গভীরতাকে মুখরিত করিয়া তোলে, তখন প্রাণের দুয়ার সহসা যেন খুলিয়া যায় ; পাল্কী হইতে মুখ বাড়াইয়া দেখি—অদূরে অন্ধকার বনের ছায়ায় ছোট গ্রামখানি। মন এখান হইতে, এই চরপরিচিত গৃহকোণকে ছাড়িয়া, এই নিয়াখিয়ার খেয়া-ঘাট পার হইয়া আর চলিতে চাহে না।

রাত্রিমুখ হইতে রাত্রিশেষের দিকে যাত্রার মধ্যপথে এই হাস্যময়ী কল্লোলিনী নিয়াখিয়া। এই মধ্য-পথ অতিক্রম করিয়া মন কেবলি আলোকের জন্য, প্রভাতের জন্য, ব্যাকুল হইতে থাকে। কেবলি মনে হয়—আর কতদূর,—আর কত প্রহর—এমনি করিয়া অন্ধকারে চলিব !

অফুরান পথ চলার, প্রহরের পর প্রহর একটা বৈচিত্র্য-হীনতার ভিতর দিয়া বাহিত হইবার সুবিপুল শ্রান্তি এই সময় আসিয়া মনকে এমনি করিয়া আক্রমণ করে যে, সে কোনোদিকে আর চাহিতে ইচ্ছা করে না,—আপনাকে গুটাইয়াসুটাইয়া একটি কোণে পড়িয়া থাকিতে পারিলে যেন বাঁচে !

ঘুমাইয়া পড়িবার—আপনাকে এই বিশ্বজোড়া-বিলুপ্তির মধ্যে বিনা-আপত্তিতে নামাইয়া দিবার জন্য দুর্দ্দমনীয় খোঁয়ারী আসিয়াছে; যেন একটা শীতল মুষ্টি, প্রাণের সমস্ত ইচ্ছাকে—জাগিয়া রহিবার সকল চেষ্টাকে—সবলে চাপিয়া অসাড় করিয়া দিতেছে। দারুণ অবসাদ! দেখিতেছি যাত্রীদল ফিরিয়া আসিতেছে, তাহাদের কাছে ডাকিয়া শুধাইতে চাই—পথ আর কতখানি, কিন্তু পারি না। কোষের মধ্যে কীটের মতো নিশ্চল মন, একটা খট্‌-খট্‌ ছাড়া আর কোনোরূপ সাড়া দিতেছে না! পাল্কীর তলা দিয়া লণ্ঠনের আলো এবং বাহকদের দ্রুত-চঞ্চল পদক্ষেপের ছায়া, আলো-আঁধারের স্রোতের মতো অবিশ্রান্ত বহিয়া চলিয়াছে। চোখ এই আলো এবং কালো, কালো এবং আলোর গতাগতির দিকে চাহিয়া-চাহিয়া ঝিমাইয়া পড়িয়াছে।

রামচণ্ডীর বটচ্ছায়ায় পাল্কী নামাইয়া বাহকেরা কখন কে কোথায় সরিয়া গেছে! সমস্ত দেহ-মন একটা আগুনের উত্তাপ অনুভব করিতেছে এবং ধীরে-ধীরে আপনাকে জড়তার নিষ্পেষণ হইতে মুক্ত করিয়া আবার সজাগ হইয়া বাস্তবের সঙ্গে যুক্ত হইতে চাহিতেছে;—কিন্তু পারিতেছে না। চারিদিক এমনি নীরব, স্থির ও স্তিমিত যে, মনে হইতেছে একখানা প্রকাণ্ড দৃশ্য-পটের ভিতরে তাহারা আমাকে রাখিয়া গিয়াছে! মন্দিরের পিছনে—আকাশের নীলের উপরে একটিমাত্র তারার জ্যোতি স্থির হইয়া আছে। সম্মুখে প্রকাণ্ড বটগাছের শিখরে সামান্যমাত্র

কম্পন নাই ; তলদেশে—পাতার গুচ্ছে, শাখার গায়ে, আগুনের রং হলুদের প্রলেপের মতো লাগিয়া আছে—অচঞ্চল। আগুনের তপ্তকাঞ্চনবর্ণের সম্মুখে চক্রাকারে সজ্জিত মানুষের ছায়া সুতীক্ষ্ণ, সুস্পষ্ট দেখিতেছি—কিন্তু অবিরল, অবিকল, ছবির মতো।

চণ্ডীদেবীকে দর্শন করিলাম, পাল্কীতে আসিয়া বসিলাম, বাহক আসিল, পাল্কী চলিল—এত গভীর নীরবতার মাঝখানে, যে, মনে হইতে লাগিল, সেই সীমাচলে পৌছিয়াছি যেখানে বাস্তবে-অবাস্তবে স্থূলে-সূক্ষ্মে গলাগলি ভাব। নিজেই আছি কি না এ-কথাটা জানিতে চারিদিক হাতড়াইতে-হাতড়াইতে, কাঁটাবনের ঢালু পথ বাহিয়া, পায়ে-পায়ে সন্তর্পণে, একটা অচেনা অন্ধকারের দিকে পুনরায় যখন নামিয়া চলিয়াছি, সেই সময়ে সহসা খোল-করতাল ও সংকীর্ত্তনের প্রচণ্ড শব্দতরঙ্গের ঘাতপ্রতিঘাত বাস্তবকে আনিয়া মনের উপরে এমনি করিয়া আছড়াইয়া ফেলিল, যে, মনে হইল বুক বুঝি ছিঁড়িয়া পড়িল! অন্ধকারে হঠাৎ আলোর আঘাতে দৃষ্টি যেমন সঙ্কুচিত হইয়া যায়, তেমনি সুনিবিড় স্তব্ধতার মধ্যে হঠাৎ একসময়ে এই শব্দতরঙ্গের ঝন্‌ঝনায় প্রাণের তন্ত্রী বিদ্যুৎবেগে রন্‌রন্‌-করিয়াই শিথিল হইয়া পড়ে।

রামচণ্ডী—আমাদের যাত্রাপথের শেষ-ঘাট—পিছনে ফেলিয়া বহুদূরে চলিয়া আসিয়াছি। সেখান হইতে এখানেও কীর্ত্তনের সুর, যেন কোন্ পরিত্যক্ত পার হইতে একটুখানি আক্ষেপের মতো, আমাদের নিকটে পৌছিতেছে—অস্পষ্ট, মৃদু, ক্ষণে-ক্ষণে!

পাড়ি দিয়াছি যে ঘাট হইতে তাহার সংবাদ এখনো পাইতেছি; পাড়ি দিতেছি যে-পারে, তাহার সংবাদ এখনো পাই নাই;—মাঝগঙ্গায় মন সমস্ত পাল তুলিয়া যেন মন্থর গতিতে ভাসিয়া চলিয়াছে—আলোকরাজ্যের সিংহদ্বারের দিকে।

প্রাতঃসন্ধ্যার ভরপূর অন্ধকার। তারার আলো নিভিয়া গেছে। প্রভাতের আলো—সে এখনো সুদূরে। এই সাড়াশব্দ-হীন ধূসরতার মাঝে, ক্ষণেকের জন্য আমরা থমকিয়া দাঁড়াইয়াছি—কাঁধ বদলাইতে।

হরিণ যেমন বহুপথ দৌড়িয়া হঠাৎ একবার উৎকর্ণ, উদ্‌গ্রীব হইয়া দাঁড়ায়, তারপরে পথের ঠিকানা পাইয়া তীরের মতো সেইদিকে চলিয়া যায়, তেমনি আমরা উড়িয়া চলিয়াছি—সিন্ধু-তীরের নিষ্কলুষ ধবলতার উপর দিয়া, একটা বিশাল গম্ভীর কল্লোলের মুখে—নির্ভয়ে, বাতাসে বুক ফুলাইয়া।

জ্যোতিমন্দিরের সিংহদ্বার অতিক্রম করিতেছি। আলো গলিয়া আমাদের পায়ের নীচে বিছাইয়া যাইতেছে, শব্দ গলিয়া আমাদের আশেপাশে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিতেছে। যতদূর দৃষ্টি চলে, ততদূর কালো-সমুদ্রের সাদা-আলো,—মায়ার প্রাচীরের মতো, অবিরাম চোখের সম্মুখে জাগিয়া উঠিতেছে, ভাঙিয়া পড়িতেছে!

রাত্রি চতুর্থ প্রহর। বিশ্বমন্দিরে উত্থান-আরতি বাজিতেছে। কালোর দুন্দুভি, আলোর তালে ধ্বনিত হইতেছে—দিকে দিগন্তে

সীমে অসীমে! এই জ্যোতির্ম্ময় ঝন্‌ঝনার ভিতর দিয়া, এই বিগলিত আলোকের চলায়মান, শব্দায়মান আস্তরণের উপর দিয়া, দ্রুত-পদক্ষেপে ইহারা আমাকে লইয়া চলিয়াছে—বরুণ-দেবতার অনুচরগণের মতো—নীল, নগ্ন, দীর্ঘকায়! আলোকবিধৌত সিন্ধুতীরে ইহাদের পদক্ষেপ ছায়া ফেলিতেছে না, চিহ্ন রাখিতেছে না!

বালুতট ওদিকে গড়াইয়া চন্দ্রভাগার কোলে পড়িয়াছে, এদিকে গিয়া সমুদ্রজলে নিজেকে হারাইয়া দিয়াছে। রাত্রি—আলো-আঁধারের, ধ্বনিপ্রতিধ্বনির মরীচিকার পারে, প্রহর-শেষের নিশ্চল-ধূসরতা-দিয়া-গড়া নীরব এই বালুতটে আমাদের ক'টিকে আছড়াইয়া ফেলিয়া যেন বহুদূরে সরিয়া গেছে।

নূতন দিন জন্ম লইতেছে—অনাবৃত আলোকে, নীরবতার মাঝখানে, আনন্দময়ী ঊষার অঙ্কে। বিশ্বব্যাপী প্রসববেদনার আঘাতে মেঘ ছিঁড়িয়া পড়িতেছে, সমুদ্র আলোড়িত হইতেছে, বাতাস মুহুর্মুহু শিহরিতেছে! একাকী এই জন্ম-রহস্যের অভিমুখে চাহিয়া দেখিতেছি। একটিমাত্র রক্তবিন্দু! পূর্ব্বসন্ধ্যার অরুণিমার উপরে বিশ্বজগতের পূর্ব্বরাগের একটিমাত্র বুদ্বুদ—অখণ্ড অম্লান! অনন্তের পাত্রে টল্‌টল্ করিতেছে! জ্যোতির রথ, মহাদ্যুতি এই প্রাণ-বিন্দুটিকে বহিয়া আমাদের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে—সপ্তসিন্ধুর জলোর্ম্মি ভেদ করিয়া, জাগরণের জ্যোতিষ্মান চক্রতলে সুষুপ্তিকে নিষ্পেষিত করিয়া! পূর্ব্ব-আকাশে এই শোণিতবিন্দুর আভা

লাগিয়াছে, সমুদ্র-তরঙ্গ বহিয়া তাহারই প্রভা গড়াইয়া আসিতেছে। পাণ্ডুর তটভূমি দেখিতে-দেখিতে রক্তচন্দনের প্রলেপে প্লাবিত হইয়া গেল, রক্তবৃষ্টিতে চন্দ্রভাগার তীর্থজল রাঙিয়া উঠিল; মৈত্রবনের শিখরে কোণার্ক-মন্দিরের প্রত্যেক কোণ, প্রতি শিলাখণ্ড, আতপ্ত রক্তের সজীব প্রভা নিঃশেষে পান করিয়া অনঙ্গ দেবতার উল্লসিত কেলিকদম্বের মতো প্রকাশ পাইতে লাগিল।

মানুষের গড়া কোণার্কের এই বিচিত্র রথ দেখিতেছি—কত যেন ক্ষুদ্র! সূর্য্যের তেজ ধারণ করিয়া, তাহারই শক্তিতে ঊর্দ্ধে বাড়িয়া আপনাকে চিরশ্যামল, চিরশোভন রাখিয়াছে এই যে বনস্পতি, ইহারও ঊর্দ্ধে কোণার্কের রথধ্বজা উঠিয়া তিষ্ঠিতে পারে নাই;—আপনার ভারে আপনি ভাঙিয়া পড়িয়াছে।

জরাজীর্ণ, বজ্রাহত এই মন্দিরের উপর হইতে অরুণোদয়ের রক্ত আভার মোহ সরিয়া গেছে। দিনের প্রখর আলোয় সে তাহার সমস্ত দীনতা লইয়া বনস্পতিটির আড়ালে আপনাকে যেন গোপন করিতে চাহিতেছে, মিলাইতে চাহিতেছে! দূর হইতে কোণার্কের এই হীন এবং দীন ভাব মনকে যেন লোহার মতো শক্ত করিয়া দিয়াছে। উহার দিকে আর এক-পাও অগ্রসর হইতে ইচ্ছা নাই। কিন্তু তবু চলিয়াছি—চন্দ্রভাগা উত্তীর্ণ হইয়া, অসমতল কালিয়াইগণ্ড পায়ে-পায়ে অতিক্রম করিয়া—মানবশিল্পের একটা সুবিদিত আকর্ষণ-বশে—চুম্বকের টানে লোহার মতো।

মন টানিতেছে! ঐ বটচ্ছায়ায় মন টানিতেছে, ঐ চূড়াহীন মন্দিরের দিকে মন টানিতেছে, ঐ ঝরিয়া-পড়া, ঝুঁকিয়া-পড়া, বালুশয়ানে-শুইয়া-পড়া রাশি-রাশি পাথরের দিকে মন টানিতেছে!

কোণার্কের বিরাট আকর্ষণে বাধা দেয় ঐ বনস্পতিটির শ্যাম যবনিকা। সেটি সরাইয়া মৈত্রবনের ছায়ানিবিড় আশ্রমটি পার হইয়া যে-মুহূর্ত্তে কোণার্কের অন্তঃপুর-প্রাঙ্গণে পা রাখিয়াছি অমনি দৃষ্টি-মন সকলই, অগ্নিশিখার চারিদিকে পতঙ্গের মতো, আপনাকে ঘুরাইয়া-ঘুরাইয়া শ্রান্ত করিয়া ফিরিতেছে,—কিছুতে আর তৃপ্তি মানিতেছে না!

চিরযৌবনের হাট বসিয়াছে! চিরপুরাতন অথচ চিরনূতন কেলিকদম্বতলে নিখিলের রাসলীলা চলিয়াছে—কিবা রাত্রি, কিবা দিন—বিচিত্র বর্ণের প্রদীপ জ্বালাইয়া, মূর্ত্তিহীন অনঙ্গ-দেবতার রত্নবেদীটি ঘিরিয়া।

এখানে কিছুই নীরব নাই, নিশ্চল নাই, অনুর্ব্বর নাই! পাথর বাজিতেছে মৃদঙ্গের মন্দ্রস্বনে, পাথর চলিয়াছে তেজীয়ান্ অশ্বের মতো বেগে রথ টানিয়া, উর্ব্বর পাথর ফুটিয়া উঠিয়াছে নিরন্তর-পুষ্পিত কুঞ্জলতার মতো—শ্যাম-সুন্দর-আলিঙ্গনের সহস্রবন্ধে চারিদিক বেড়িয়া! ইহারই শিখরে—এই শব্দায়মান, চলায়মান উর্ব্বরতার চিত্রবিচিত্র শৃঙ্গারবেশের চূড়ায়—শোভা পাইতেছে কোণার্কের দ্বাদশ-শত শিল্পীর মানস-শতদল,—সকল গোপনতার সীমা হইতে বিচ্ছিন্ন, নির্ভীক, সতেজ, আলোকের দিকে উন্মুখ।

এইবার ফিরিতেছি—উদয়ের পার হইতে আবার সেই অস্তের পারে;—আর-একবার সংসারের দিকে, সুরুচি-কুরুচি, শ্লীল-অশ্লীলের দিকে।

কোণার্ক আমাদের নিকটে বিদায় লইতেছে। মরুশয্যায় অর্দ্ধনিমগ্না পড়িয়া আছে সে—পাষাণী অহল্যার মতো সুন্দরী;—নীরব, নিস্পন্দ,—মণিদর্পণে নিশ্চল দৃষ্টি রাখিয়া, দিগন্ত-জোড়া মেঘের ম্লান আলোয় যুগযুগান্তরব্যাপী প্রতীক্ষার মতো, শত-সহস্রের গমনাগমনের একপ্রান্তে, সুদুর্ল্লভ একটি-কণা পদরেণুর প্রত্যাশী!

নিষ্ক্রমণ

মায়ের পরশ! আলোয়-ধুলোয় লোকে-লোকাকীর্ণ সহরের কিনারা দিয়েই এই নির্ম্মল পরশখানি একটুখানি নদীর বাতাস হয়ে বহে চলেছে। এপার থেকে ওপারে যাবার, পার থেকে ঘরে আসার সেতু-পথে চকিতের মতো এই পরশ,—গঙ্গাজলে ধোয়া এই পরশ!

এই শান্ত সুস্নিগ্ধ পরশখানির এক-পারে দেখছি পরিচিত পুরাতন দেশ, আর-পারে দেখা যাচ্ছে প্রবাস-বাসের সিংহদ্বার—হিমরাত্রির অন্ধকার মাখা।

বিপুল জনস্রোতের সঙ্গে একত্রে ছুটে চলেছি, ঠেলে চলেছি—

নিঃশব্দে, নীরবে; আর নদীর উপর দিয়ে অবিশ্রান্ত বহে আস্‌ছে কাজল আকাশ—কালো-জলের সমস্ত স্নেহমাথা মায়ের পরশ!

অন্ধকারের মাঝখান থেকে একটা তীব্র বাঁশি দিক্‌দিগন্তের সুনীল পরিসর হঠাৎ ছিন্ন কোরে দিয়ে চীৎকার কোরে উঠল! আবার আলো, আবার ধুলো, আবার জনকোলাহল! এ-সমস্তকে ছাড়িয়ে যখন পৃথিবী-জোড়া প্রকাণ্ড রাত্রি ভেদ কোরে চলেছি, তখন কেবল শুন্‌ছি পায়ের তলা দিয়ে একটা ঝন্‌ঝনা লৌহ-নির্ঝরের মতো ক্রমাগত গড়িয়ে চলেছে।

গাড়ির দুই-সারি জান্‌লার ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে কেবলমাত্র দুই-ফালি আস্‌মানি পর্দা, তার মাঝে-মাঝে ঝক্‌ঝকে এক-একটি তারা।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা নীলের এই দুই যবনিকার ভিতর চলেছি। দক্ষিণে, বামে কিছুই দেখছিনা; কেবল সম্মুখ থেকে একটার পর একটা ঝন্‌ঝনার ধাক্কা আস্‌ছে আর মাঝে-মাঝে হঠাৎ এক-একটা গাছের ঝাপ্‌সা মূর্ত্তি চোখের উপরে এসে আঘাত কোরেই সরে যাচ্ছে।

বিরাট রাত্রির এই প্রকাণ্ড বৈচিত্র্য-হীনতার ভিতর দিয়ে উড়ে চলেছি বল্লে ভুল হয়। নিশাচর পাখীরা রাত্রির নীরব নীলের মধ্যে আপনাদের নিশ্চল পাখা মেলিয়ে নিঃশব্দে যেমন ভেসে যায়, এ তেমন কোরে যাওয়া নয়, এ যেন একটা উন্মত্ত দৈত্য চাকা-দেওয়া লোহার খাঁচায় আমাকে বন্ধ কোরে পৃথিবীর উপর দিয়ে দৌড়ে

চলেছে; তার চলার প্রচণ্ড বেগে লোহার খাঁচাটা পৃথিবীর বুক-আঁচড়ে চারিদিকে অগ্নিকণা ছিটিয়ে অন্ধকুহরের ভিতর ক্রমান্বয়ে এগিয়ে চলেছে।

সুদীর্ঘ অনিদ্রা, অফুরন্ত অস্থিরতা, তার পরে বিরাট অবসাদ! নির্জ্জীব প্রাণ নিরুপায় অবোলা একটা জন্তুর মতো চুপ কোরে পড়ে আছে—অপার অন্ধকারের মুখে দুই-চোখ মেলে।

একটুখানি আলোর আঘাত,—নিশীথ-বীণায় সোনার তারের একটুখানি তীব্র কম্পন। উষার অচঞ্চল শিশির, তার মাঝখানে একটিবার স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছি—নূতন দিনের দিকে মুখ কোরে। পৃথিবীর পূর্ব্বপার-পর্য্যন্ত অনেকখানি অন্ধকার এখনো রাশীকৃত দেখা যাচ্ছে। কৃষ্ণসার চর্ম্মের মতো একটি কোমল অন্ধকার, তারি উপরে আলোর পদক্ষেপ ধীরে ধীরে পড়ছে! সম্মুখে দেখা যাচ্ছে একটি পদ্মের কলিকা জলের মাঝে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে;—যেন ভূদেবী বিশ্বদেবতাকে নমস্কার দিচ্ছেন।

পথিক যেমন পথ-চল্‌তে ক্ষণিকের মতো পথপ্রান্তে দেবতার দেউলটিতে একটি নমস্কার দিয়ে পুনরায় চল্‌তে আরম্ভ করে, আমরা তেমনি এই প্রাতঃসন্ধ্যাটিকে প্রণাম কোরেই যেন আবার অগ্রসর হচ্ছি।

একটা কূলকিনারা-হারা বালুচরের ঠিক আরম্ভে রাত্রি প্রভাত হয়েছে। আকাশের বর্ণ দূরে-দূরে নদীর ক্ষীণ ধারাগুলিকে সুতীক্ষ্ণ ছুরির মতো উজ্জ্বল কোরে তুলেছে। পৃথিবীর শেষপ্রান্ত-পর্য্যন্ত

বিস্তৃত হয়ে পড়েছে—পরিস্কার ফিরোজার একটি মাত্র প্রলেপ; তার উপরে একঝাড় কুশ আর কাশ। নূতন সূর্য্যালোক কাশ-ফুলের শ্বেত-চামরের উপরে আবীর ছড়িয়ে সমস্ত ছবিটিকে রাঙিয়ে তুলেছে। নির্জ্জন এই নদীর পার, নিঃশব্দ নিশ্চল এই নদীপারের বালুচর,—এর ভিতর দিয়ে জলের ক্ষীণধারা আমাদেরই মতো মন্দগতিতে চলেছে।

নদী থেকে শত-শত হাত উর্দ্ধ দিয়ে সেতুপথ বেয়ে চলেছি। একটি মৃদুমন্দ দোলা, গতির একটা শিহরণ মাত্র,—এছাড়া আর-কিছু অনুভব হচ্ছেনা। চলেছি, চলেছি—দিনের মন-ভোলানো সবুজের মাঝ দিয়ে, রাতের ঘুমপাড়ানো নীলের দিকে।

অশেষ পথ, সুদীর্ঘ প্রহর-পলের ভিতর দিয়ে, ক্রমাগত চলেছে; দিন ও রাত্রি এই-পথের দুইধারে নিরাবরণ ও আবরণের দুইখানি মায়াজাল রচনা করতে-করতে আমাদেরই সঙ্গে চলেছে।

বারাণসী—মন্দির-মঠের একটা প্রকাণ্ড অরণ্য; দ্বিপ্রহরের সূর্য্যালোকে তার সমস্তটা সুস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে,—জনশূন্য স্নানের ঘাটে সোপানের কোলে-কোলে নদীজলে বিজলী রেখাটি থেকে, তপ্ত পথে নিঃশব্দে যে-যাত্রীরা চলেছে তাদের গাঢ় ছায়াটি পর্য্যন্ত। এ যেন একটা মায়াপুরীর দিকে চেয়ে রয়েছি! পাষাণ-প্রাচীর-গুলো থেকে একটা উত্তাপ মুখে এসে লাগছে, নাগরিকদের সমস্ত গতিবিধি কার্য্যকলাপ আমাদের চোখে পড়ছে স্পষ্ট, কিন্তু তাদের কোনো সাড়াশব্দ আমাদের কাছে পৌঁছতে পারছেনা। এ যেন

একটা মূকের রাজত্ব পেরিয়ে চলেছি। আর শব্দের সীমার বাহিরে তাদের এই প্রকাণ্ড নগরী, উর্দ্ধ-আকাশে পাংশু দুইটা পাষাণ-বাহু তুলে, একটা ভাষাহীন নিবারণের মতো দূর-দূরান্তরের দিকে চেয়ে রয়েছে—দুইপ্রহর-বেলার শব্দহীন আলোকের গায়ে চিত্রার্পিত।

রৌদ্রদগ্ধ প্রান্তরের উপরে বেলাশেষের তাম্র আভা। আম্র-বনের ছায়ায়-ছায়ায় রাত্রি আপনার আশংসা নিয়ে এখনি দেখা দিয়েছে। বনরেখার উপরে অযোধ্যার শেষ-নবাবের বহুকালের পরিত্যক্ত প্রাসাদের একটা অংশ আকাশের পরিস্কার নীলের গায়ে শুষ্করক্তের গাঢ় একটা বিমলিন ছাপ ফেলেছে। বাঁধ-ভাঙা গোমতীর জল প্রকাণ্ড একটা ছিন্ন কন্থার মতো পৃথিবীর উপরে বিস্তৃত হয়ে পড়েছে—অনেক দূর পর্য্যন্ত সমস্ত সবুজকে আচ্ছাদন কোরে।

পশ্চিম-দিগন্তব্যাপী শোণিমার নীরব একটি নির্ঝর আকাশ থেকে পৃথিবীর উপর পর্য্যন্ত নেমে এসেছে; রাতের পাখী এরি উপর দিয়ে কালো ডানা-মেলে উড়ে আসছে।

রাত্রি তৃতীয়-প্রহরে বৃষ্টি নেমেছে, পাহাড়ের হাওয়া অন্ধকারের ভিতর দিয়ে মুখে এসে লাগছে—বরফের মতো। দূর-দূরান্তরে একটিমাত্র ঝিল্লি অন্ধকারে শব্দের একটা উৎস খুলে দিয়ে ক্রমান্বয়ে গেয়ে চলেছে। একটা পান্থশালার প্রদীপ জলে-ধোয়া পৃথিবীর মসৃণতার উপরে আপনার আলোটি অনেক-দূর-পর্য্যন্ত বিস্তৃত কোরে দিয়ে অনিমেষে রাত্রির দিকে চেয়ে রয়েছে।

নিরন্ধ্র অন্ধকারকে ধাক্কা দিতে-দিতে গাড়ি চলেছে—হিমালয়ের যেদিক বেয়ে গঙ্গা নামছেন সেই দিক হয়ে।

এখানে মেঘ-কেটে চাঁদ দেখা দিয়েছেন—অন্ধকার গিরিশ্রেণীর চূড়ায়। অদূরে স্নানের ঘাট, নহবৎখানা, মন্দির-চূড়া জ্যোৎস্নায় ঘুমিয়ে আছে; গঙ্গার বাতাস সমস্তটির উপরে স্নিগ্ধতা ঢেলে দিয়েছে। আমাদের যাত্রা-পথের শেষে, সুদীর্ঘ রাত্রির অন্তিম-প্রহরে এই গঙ্গাদ্বার! এরি ওপারে সূর্য্যদেবের হরিতাশ্বসকল অপেক্ষা করচে—নূতনকে অদৃষ্টপূর্ব্বকে জগতে বহন কোরে আনবার জন্য।

আরোহণ

রাজপুরের পান্থশালায়, হিমালয়ের ঠিক পায়ের কাছটিতে বসে বিশ্রাম করছি। বরফের বাতাস-দিয়ে-ধোয়া তরুণ প্রভাত; আকাশ-জোড়া পাহাড়ের কোলে ছোটো এই সহরের ঘরে-ঘরে জাগরণের সোনার কাঠি স্পর্শ করে যাচ্ছে। দক্ষিণে একটি গিরিনদী, গোপন গুহা থেকে স্বচ্ছ ধারাটি তার উপলখণ্ডের উপর দিয়ে, পুষ্পিত কুঞ্জের ভিতর দিয়ে নেমে এসেছে—তরল কল্লোলে পৃথিবীর বুকের উপর; আর বামে উঠে গেছে গিরিপথ—পৃথিবী ছেড়ে ক্রমাগত আকাশের দিকে, ঊর্দ্ধ হতে ঊর্দ্ধে, মেঘের অন্তরালে। এই আকাশের দিকে উঠে-চলা আর এই অনন্ত

সাগরের দিকে নেমে-আসা—এরি মাঝে মুহূর্ত্তের বিশ্রাম এই পান্থশালার কুঞ্জতীরে।

পর্ব্বতের নীলের ভিতরে প্রবেশ করছি। চোখ-জুড়ানো নীল অঞ্জন, ঘুম-পাড়ানো নীল রহস্য,—এরি একটি স্নিগ্ধ আভা সমস্ত দিনটিকে, সকল পথটিকে সুশীতল করেছে।

পাহাড়ের একটা বাঁক। মেঘ-ফাটা রৌদ্রে একখানা প্রকাণ্ড পাথর, মাথায় একবোঝা শুক্‌নো ঘাস চাপিয়ে, পথের ধারে দাঁড়িয়ে আছে। ওধারে ভীষণ একটা ভাঙন—পাহাড়ের গায়ে অগ্নিদাহের ক্ষত-চিহ্নের মতো কালো দেখা যাচ্ছে। প্রখর রুদ্র-মূর্ত্তিতে দিক্‌বিদিক্ এখানে দেখা দিয়েছে—যেন দুঃস্বপ্নহত! একটা নির্জ্জীব ঘোড়া এরি মাঝ দিয়ে একরাশ পাথর বহে চলেছে—পাষাণ-প্রাচীর-ঘেরা একটা রাজ-অট্টালিকার দিকে।

এ-পাহাড়ের আর-একটা বাঁক। বনতরুর ঘন-পল্লবের তলায় ছায়া—একখানি নীড়ের মতো—পায়ের তলা থেকে মাথার উপর পর্য্যন্ত ঘিরে নিয়েছে। চির-রাত্রি এখানে অবগুণ্ঠন টেনে, কোলের মধ্যে ঝরা-পাতা নব-কিশলয় জীবন-মরণ সবাইকে নিয়ে দোলা দিচ্ছেন—নির্জ্জনে, মেঘ-রাজের গোপন অন্তঃপুরে।

পর্ব্বতের সানুদেশ অতিক্রম করছি। দুইধারে উপবন; তারি মাঝ দিয়ে পথ; জনমানব নেই; কিন্তু সমস্ত যেন কারা সযত্নে সুমার্জ্জিত করে রেখেছে! সুবিন্যস্ত তরুশ্রেণী, সুশ্যাম সুচারু তৃণভূমি; তারি প্রান্তে দেখা যাচ্ছে পার্ব্বতী মন্দির—

সুধাধবল। এরি ওপরে পাহাড়ের নীলের কূলকিনারাহারা একটি-মাত্র গভীর প্রলেপ বর্ষার মেঘের মতো আকাশ ঢেকে রয়েছে। এই কালোর উপরে আলো নিয়ে শোভা পাচ্ছে সমস্ত দৃশ্যটি স্থির বিদ্যুতের মতো। দেখতে-দেখতে কুয়াশা এসে সমস্ত দৃশ্যটি মুছে দিয়ে গেল; অনাবিল শুভ্রতার কোলে ফুটে উঠলো সোনার ফুলে সাজানো একটিমাত্র কর্ণিকার।

মেঘের মধ্যে দিয়ে চলেছি। কুয়াশার সুবিমল শিশির-চুম্বন মুখে লাগছে, চোখে লাগছে—প্রাণের ভিতর পর্য্যন্ত স্পর্শ করছে—পথের ক্লেশ-ক্লান্তি ধুয়ে-মুছে।

পাহাড়ের একটি অন্ধকার কোণ। লতাপাতার ভিতর থেকে একটা জলপ্রপাত নেমেছে; তারি উপরে অপরিসর সেতু ছত্রাকে-ভরা জীর্ণ একখানি কাঠের উপর ভর দিয়ে রসাতলের দিকে চেয়ে রয়েছে। একখানা বিশাল পাথর অতলস্পর্শ অন্ধকারের উপরে ঝুঁকে রয়েছে; আর তারি তীরে বনদেবীটির মতো বনলতা—পুঞ্জপুঞ্জ তারাফুলের একটিমাত্র গুচ্ছ! জলের হাওয়ায় কাঁপছে—কচি পাখীর ডানাদুখানির মতো দুটি লতাবল্লরী; আর তারি পাশ দিয়ে ফেনিল জল চলেছে অট্টরোলে অতলের মুখে! ঝাঁপিয়ে-পড়া, গড়িয়ে-চলা, তলিয়ে-যাওয়ার একটা প্রকাণ্ড ডাক! অনেকখানি জুড়ে দূরে-দূরে পর্ব্বতে-পর্ব্বতে রণিত হচ্ছে এই নিরুদ্দেশের দিকে নৃত্য-করে-চলে-যাওয়ার, এই গহনের কোলে ঝাঁপিয়ে-পড়ার ঝনৎকার!

মেঘরাজ্যের উপরে উঠে এসেছি। প্রকাণ্ড অজগরের নির্ম্মোকের মতো একখণ্ড কুয়াশা সমস্ত গিরিশ্রেণীটি বেষ্টন করে নিশ্চল হয়ে রয়েছে। নীচে একটা সুদীর্ঘ কালো ছায়া পাহাড়ের গায়ে অনেক-দূর-পর্য্যন্ত লতিয়ে উঠেছে; আর উপরে একটা সবুজ উচ্ছ্বাস নীল আকাশে তরঙ্গিত দেখা যাচ্ছে! ঐখানে—নির্মেঘ ঐ নীলের বুকে, শরতের সুতীক্ষ্ণ হাওয়ায়, কোন্ দেবদারু-বনের ছায়ায় আমাদের এবারের নীড়;—মন যেখানে উড়ে যেতে চাচ্ছে এখনি,—অর্দ্ধপথের পান্থশালা ছেড়ে।

পাহাড়ের গা দিয়ে একটি সরু পথ; একদিকে খাড়া-পাথরের দেয়াল, আর-একদিকে অতলস্পর্শ শূন্য! অনেক দূরে—যেন একটা প্রকাণ্ড হ্রদের পরপারে, ধূসর গিরি-শ্রেণী দেখতে পাচ্ছি। একখণ্ড মেঘ শূন্যের উপরে সাদা পাল তুলে ধীরে-ধীরে চলেছে—বাতাস তাকে যেদিকে নিয়ে যায়! মাঝে-মাঝে পর্ব্বতের এক-একটা মোড়-নেবার সময় এই শূন্যের উপর দিয়ে খেয়া দিতে-দিতে চলেছে আমার এই জীর্ণ কাঠের দোলাখানি! পাথর আপনার অটুট পরমায়ু, লতাপাতা আপনাদের ক্ষণিকের জীবন-যৌবন নিয়ে এই শূন্যতার একেবারে তীরে এসে প্রতীক্ষা করছে—ঝরে-যাবার জন্য, খসে-যাবার জন্য। এইখানে একটি পাখীর গান! অদূরে বনের নিবিড় ছায়া থেকে সে ক্রমান্বয়ে বলছে—পিয়া পিয়া পিউ পিউ।

শুষ্ক নদীর খাতের মতো উসর একটা গিরিসঙ্কট; তারি

মোহড়ায় একটা লোক সরকারি-আফিসে বোসে যত লোকের কাছে চুঙ্গি আদায় করে ছেড়ে দিচ্ছে। একটা বুভুক্ষিত কুকুর এইখানের চারিদিকে মাটি-শুঁকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পর্ব্বতের সুনীল ছায়া, সমস্ত শোভা, এই শুষ্ক ভূমিটাকে ছেড়ে, দেখছি, অনেক দূরে পিছিয়ে গেছে! এ যেন আকাশের উপরে একটা রাশীকৃত পাথর আর ধূলার মরুভূমি! এরি পরে বনের নীলের মধ্যে আর-একবার অবগাহন। সেখানে পায়ের তলায় পাহাড় ক্রমান্বয়ে অন্ধকারের ভিতরে গড়িয়ে গেছে। দিন সেখানে যেতে পারেনি; কেবলমাত্র কেলুবনের শিখরে-শিখরে পূর্ব্ব-সন্ধ্যার একটু ধূসর জ্যোতি নিক্ষেপ করেই ক্ষান্ত হয়েছে। সূর্য্যদেব এখন মধ্য-গগনে বিরাজ কচ্ছেন, কিন্তু এই বনরাজির তলায় শিশিরসিক্ত ঝরা-পাতার বিছানায় এখনো রাত্রি! ঝিল্লিরবের ঘুম-পাড়ানো সুর এখানে বাজছেই—কিবা রাত্রি, কিবা দিন। পুরাতন অরণ্যানীর নিসুপ্তির মধ্যে এই একটিমাত্র ডুব দিয়েই পথ একেবারে জনতা, সভ্যতা, কর্ম্মকোলাহলের মাঝখানে গিয়ে মাথা তুলেছে। একটা মানুষ এখানে কর্কশ গলায় চীৎকার কোরে কেবল ডাকছে—“ফাল্‌তো, ফাল্‌তো, এ ফাল্‌তো! এরে বেকার কুলী!”

সভ্যতার এই প্রবেশ-দ্বারেই একদিকে রয়েছে দেখি ‘ওল্ড-ক্রুয়ারী’ বা পুরাতন মদের ভাটি; আর-একদিকে কতকগুলা দোকান ঘর; সেখানে একটা দর্জ্জি, সে বোসে কাপড় ছাঁটছে,

আর একটা টেবিলের সাম্‌নে সোডা লেমনেড্ হুইস্‌কির বোতল সাজিয়ে হোটেলওয়ালা দাঁড়িয়ে আছে। এখান থেকে ক্রমাগত চোখকে পীড়া দিচ্ছে টিনের ছাদ, পোষ্ট আফিস, রয়েল হোটেল, ব্যাণ্ডষ্ট্যাণ্ড, সাহেবদের হ্যাটকোট; একটা মাড়োয়ারি রাজার ক্যাসেল এবং পর্ব্বতের গায়ে বড়-বড় অক্ষরে ছাপা নিলাম, কন্‌সার্ট ও স্কেটিংরিঙ্কের বিজ্ঞাপনী! বাহকেরা যখন দেখিয়ে দিলে আমাদের বাসাটা অনেক দূরে—আর-একটা পর্ব্বতের শিখরদেশে, তখন মনটা যেন সুস্থির হল।

দুর্গম দুরারোহ গিরিপথ উচ্চ হতে উচ্চ হয়ে বন্ধুর একটা গিরিসঙ্কটে গিয়ে প্রবেশ করেছে; তারি শেষে, পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শিখরে—হাট-বাজারের অনেক ঊর্দ্ধে—পাখীর বুকের পালকের মতো শুভ্র সুকোমল মেঘে-ঘেরা শরতের আমার এবারের বাসা—ফুলে-ঢাকা পর্ব্বতের একটা বিশাল অলিন্দের একটি কোণে, গোলাপলতা আর মল্লিকাঝাড়ের পাশাপাশি!

বিচরণ

আমাদের সেখানে আর এ-পাহাড়ের ঋতু-পর্য্যায়ে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। বসন্ত এখানে এসে-যায়—শীতের আগেই, দিক্‌বিদিকে ফুলের মেলা বসিয়ে দিয়ে। আমাদের সেখানে যখন ফুলেদের বাসর-জাগবার পালা, এখানে তখন তুষারের বিছানায়

ঘুমিয়ে গেছে সব ফুলগুলি। সেখানে বসন্ত দেখা দেয় শীতের আসরে শিউলি-ফুল ছড়িয়ে; এখানে শীত আসে বসন্তের সভায় সাদা চাদর টান্‌তে-টান্‌তে, ফুল মাড়িয়ে।

শীত গলে-পড়ছে বর্ষায়, বর্ষা ফুটে-উঠছে বসন্তে, বসন্ত ক্ষীণ হতে-হতে শরতের জ্যোৎস্নার মধ্যে-দিয়ে ঝিক্‌মিক্‌ করতে-করতে তুষারের শুভ্রতায় গিয়ে শেষ হচ্ছে;—এখানের ছন্দটা এইরূপ।

এখানে এসে অবধি হিমালয়কে একবার দেখে নেবার জন্যে উঁকি দিচ্ছি—এখানে-ওখানে, সকালে-সন্ধ্যায়। কিন্তু অচল সে, কুয়াশার ভিতরে কোথায় যে চলে গেছে, সপ্তাহ ধরে তার সন্ধানই পাচ্ছি না।

এ যেন একটা নিহারিকার গর্ভে বাস করছি! দিন এখানে আস্‌ছে—উত্তাপহীন অনুজ্জ্বল; রাত আস্‌ছে—অঞ্জনশিলার মতো হিম অন্ধকার।

আমার চারিদিকে সবেমাত্র দশবিশ হাত পৃথিবী—গুটিকতক ফুল-পাতা নিয়ে,—যেন অগোচরের কোলে একটুক্‌রো জগৎ; আর আমরা যেন এক-ঝাঁক দিশেহারা পাখী এইখানটায় আশ্রয় নিয়েছি। আমাদের কাছে চারিদিক এখনো অপরিচিত রয়েছে। শিল্পী এখনো যেন তাঁর রং-তুলির কাজ সুরু করেননি,—সবেমাত্র কুয়াশার শুভ্রতার গায়ে পার্ব্বত্য দৃশ্যের আমেজ একটু-একটু দেগে রেখেছেন—অসম্পূর্ণ, অপরিস্ফুট।

-এই-যে পরিচয়ের পূর্ব্বমুহূর্ত্তে কুয়াশার যবনিকাটি তুলছে—

এপারে-ওপারে বিচ্ছেদের সূক্ষ্ম ব্যবধান—একে সরিয়ে যেদিন শুভদৃষ্টি হবে, সেদিন অন্তর গিয়ে মিলবে বাহিরে, বাহির এসে লাগবে অন্তরে! এই কথাটাই একগোছা সবুজ-পাতা আমার জানলার কাচের বাহিরে কেবলি ঘা-দিয়ে-দিয়ে জানাচ্ছে—কাচের এপারে ঘরের বন্দী প্রকাণ্ড একটা পতঙ্গকে। অজানার দিক থেকে একটির-পর-একটি দূত—চঞ্চল একটি নীল পাখী, ছোট একটি মৌমাছি—তরুলতার কানে-কানে, অপরাজিতার ঘোমটা একটু খুলে, এই কথাই জানিয়ে যাচ্ছে—দিনের মধ্যে শতবার।

আজকের সন্ধ্যাটি শীতাতুর কালো হরিণের মতো পাহাড়ের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালো—অন্ধকারের দিকে মুখ কোরে। কলঙ্ক-ধরা একখানা কাঁসরের মতো গভীর রাত্রিটাকে কালো ডানার ঝাপ্‌টায় বাজিয়ে তুলে মস্ত-একটা ঝড় আজ মাথার উপরে ক্রমান্বয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে—যেন দিশেহারা পাগল পাখী।

রাত্রিশেষে বর্ষা দিকবধূর কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেছেন। আকাশের নীল চোখে সরু একটি কাজল-রেখার কোণে একটুখানি অরুণ আভা দেখা যাচ্ছে; আর যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল দেখছি ধূসরের অচল ঢেউ, দিকের শেষ-সীমা পর্য্যন্ত;—আর রংও নেই, রূপও নাই! এই অবিচিত্রতার মধ্যে একটি মাত্র পাহাড়ি-ফুলের কুঁড়ি, বসন্তের নববধূ সে, আলোর প্রতীক্ষা করছে! প্রজাপতির পাখার চেয়ে সুকুমার এর পাব্‌ড়িগুলি; এত ছোট, এত কচি—একেই ঘিরে আজ প্রভাতের সমস্ত সুর। সুদূর গিরি-শিখরে,

মেঘলহরীর তীরে, বনের পাখীর কণ্ঠে, নিহারের যবনিকা ঠেলে বাহিরে ছুটে এসেছে পর্ব্বতের কলভাষী দুরন্ত শিশু—এই-যে জলধারা, এর ঝরে-পড়ার মধ্যে!

কাঁচা-সোনার একটিমাত্র আভা—বসন্ত-বাউরীর বুকের পালকের অস্ফুট বাসন্তী আভা—সকালের আকাশে বিকীর্ণ হয়ে গেল। এই আলোর উপরে সব-প্রথম তুষার, আজ সে সোনার পটে যেন কাজলের লেখার মতো কালো হয়ে ফুটে উঠল।

এই কালো বরফের নিস্কলঙ্ক ললাট! এইখানে বসন্ত-দিনের—তরুণ দিনের—প্রথম আশীর্ব্বাদ পড়েছে; সে একটিমাত্র আলোর করকা! আর তারি আভা তুষারের সহস্র-ধারায় হিমালয়ের অন্ধকার আলো-কোরে গড়িয়ে আসছে পৃথিবীর দিকে ফুল-ফোটার ছন্দটি ধরে।

আমার এ-বাগানখানি পাহাড়কে আঁকড়ে-ধরে শূন্যের উপরে ঝুলে রয়েছে। এখানে একঝাড় পাহাড়-মল্লিকা, এক-ঝাঁক পাখী আর আমি! এইখানটিতে তুষারের বাতাস নিয়ত গাছের ফুল, পাখীর গান ফুটিয়ে তুলছে। আমার গান নেই। সকাল-সন্ধ্যায় একখানা পাথরের মতো নিশ্চল নির্ব্বাক আমাকে, বাতাস আর আলো শুধুই স্পর্শ করে যাচ্ছে।

আমাদের যারা অনেকবার পাহাড়ে এসেছে এবং যারা নূতন আগন্তুক তাদের দেখি ওঠা-নামা, চলা-ফেরার অন্ত নেই। যেখানে ইংরাজি বাদ্য, গোরার নাচ সেই-সকল মেলাতেই এরা

ত্রিসন্ধ্যা যোগ দিয়ে ঘুরছে, কেবলি ঘুরছে,—হয় ঘোড়ার পিঠে, নয়তো নিজের পায়ে দুইজোড়া চাকা বেঁধে! মাড়োয়ারীরাজার ফরাসী-ধরণের বৈঠকখানার চূড়োয় বাতাসের ধনুকে-চড়ানো ঐ লোহার তীরটার মতো, এরা দেখি, শূন্যকে বিঁধে-বিঁধেই কেবলি ঘুরছে বাঁধা গণ্ডীর মধ্যে—ছুটেও চলছে না, উড়েও যাচ্ছে না।

আমার চলার গণ্ডীটাও যে খুব বড়, তা নয়। একটি পাহাড়ের যে-পিঠে সূর্য্য উদয় হন, আর যে-পিঠে তিনি অস্তে যান, এইটুকুমাত্র প্রদক্ষিণ কোরে উঁচু-নীচু একটা পথ; এই পথ-দিয়ে কাঁটা-দেওয়া একটা মস্ত লাঠি নিয়ে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি—পাথর কুড়িয়ে, গাছ সংগ্রহ কোরে—মাসের মধ্যে ত্রিশ না হোক, উনত্রিশ দিন তো বটেই;—এই পথটিতেই সকালের আলোয়, সন্ধ্যার ছায়ায়, দিবা দ্বিপ্রহরে, রাতের অন্ধকারে। এইখানে পাথরের গায়ে কচি শ্যাওলার নূতন সবুজ, কেলুবনের ফাঁকে নীল-আকাশের চাঁদ, একটি নির্ঝরের শীর্ণ ধারা আর পর্ব্বত ছেয়ে দুর্গম বনের নিবিড় রহস্য; প্রাতঃসন্ধ্যায় ভ্রমরের গুঞ্জন, সায়ংসন্ধ্যায় পাখীদের গানের শেষে অন্ধকারের সেই ঝিম্‌ঝিম্—যা শুন্‌ছি, কি বোধ কচ্ছি বলা কঠিন।

এই পথের একটা জায়গায় একখানা প্রকাণ্ড সাইন্‌বোর্ড, তাতে লেখা আছে—"সাধারণ সড়ক্ নয়। অনধিকার প্রবেশ দণ্ডিত হইবে!" পর্ব্বতের কোলে এই 'সাইন্'টা আমাকে প্রথমদিন বড়ই ভয় দিয়েছিল, কিন্তু সন্ধানে জানলেম যারা এই মেয়াদের ভয় দিয়ে

সারা পাহাড় ঘিরে নিতে চেয়েছিল, তাদের মেয়াদ অনেকদিনই ফুরিয়েছে। পথটা এখন আর অনন্যসাধারণ নেই এবং সাধারণেও এই পথটার আশা অনেকদিন ছেড়ে দিয়ে, একধাপ নীচে স্কুলবাড়ী, কুয়োখানা প্রভৃতির গা-ঘেঁসে আর-একটা ঘুরুনে রাস্তা—সারকুঁলার রোড—ক্লবঘর ব্যাণ্ডষ্টাণ্ড ও বাজার পর্য্যন্ত জিলাপির পাকের ধরণে রচনা করে নিয়েছে; সুতরাং এরাস্তাটার ভবিষ্যতে পথ-হয়ে-ওঠবারও কোনো আশা নেই। এ বিপথ হয়েই রয়ে গেল,—মানুসের কাজে লেগে পথ-হয়ে-ওঠা এর ভাগ্যে আর ঘটলো না।

অনেকদিনের আনাগোনায় এই বিপথটার একটা মানচিত্র আমার মনে আঁকা হয়ে গেছে। পাহাড়ের পশ্চিম-গা বেয়ে প্রথমটা সে ঠিক পশ্চিম-মুখে সুন্দর বাঁক নিতে-নিতে "সহস্রধারা"র উপত্যকার দিকে কাৎ হয়ে চলেছে। ঠিক যেখানটি-থেকে সূর্য্যাস্তের নীচে সন্ধ্যার বেগুনি আঁধার চিরে নদী একটি রূপোর তারের মতো দেখা যায়, সেখানটিতে পৌঁছে পথ স্তূপাকার পাথরের উপর হঠাৎ লম্ফ দিয়ে অকস্মাৎ আবার পূবে মোড় নিয়ে পর্ব্বতের একটা উত্তর ঢালু বেয়ে ছুটে নেমেছে; একটু-দূর গিয়েই হঠাৎ পর্ব্বতের পূবের দেয়াল ঘেঁসে আবার পশ্চিমে দৌড়; সেখানে একদল মহিষ চোখ-রাঙিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখেই পাহাড়ের একটা গড়ানে ভাঙন দিয়ে সে দ্রুত নেমে গিয়ে সোজা আকাশের দিকে উঠেই সহসা মোড়-নিয়ে পর্ব্বতের পূর্ব্বগায়ে দিগন্ত-জোড়া

হিমালয়ের সম্মুখে দেবদারু-বনের ছায়ায় এসে লুকিয়ে পড়েছে; এই দিকটাতে সে শৈবাল-কোমল নির্ঝর-শীতল পর্ব্বতের বাঁকে-বাঁকে একলাটি খেলা করতে-করতে পর্ব্বতের পুব-পিঠে আর-একটা গলির মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছে; এখানে টিন্-মোড়া দোকান-ঘরে দর্জ্জি কোট সেলাই কচ্ছেন, রাস্তার একপাশে কাদের একগাড়ি জ্বালানী কাঠ খরিদ্দারের অপেক্ষায় পড়ে আছে, হতভাগাচেহারার দুখানা ভাঙা ডাণ্ডি আড্ডার দাওয়ায় বাহিরে চড়ায় বাধা পান্‌সির মতো কাৎ-হয়ে পড়েছে। এই পর্য্যন্তই বিপথের দৌড়; বাকি যেটুকু অতিক্রম কোরে আমাদের বাসায় উঠে যেতে হয় সেটা বিপথ না হলেও বিপদ যে তার আর সন্দেহ নেই! মানুষ সেটাকে পর্ব্বত-শিখর পর্য্যন্ত এমন তিন-চারটে বিশ্রী মোচড় দিয়ে টেনে তুলেছে যে সেখানে কোনো যানও যান্‌না, পাও চান্‌না যে চলি।

বিপথের শেষে পথের এই মোড়টা যেন ইস্কুল-মাষ্টার, নয়তো ধর্ম্মপ্রচারক! তার বুলিই হচ্ছে—'এইবার পথে এসো!' নয়তো সে বলছে—'বিপথ হইতে পথে আইস।' এই যে রোড—সেণ্ট-ভিন্‌সেণ্ট বা তপস্বী ভিন্‌সেণ্ট-মহোদয়ের রাস্তা—এখানে নিরালা একটুও নেই;—মানুষের সকৌতুক তীক্ষ্ণদৃষ্টির চোর-কাঁটা এখানে আমার মতো বিপথের পথিকদের জন্য শরশয্যা রচনা কোরে রেখেছে। পেন্‌সন্‌ভোগী এক কাবুলী আমীরের নূতন বয়ঃপ্রাপ্ত দুইচারি বংশধর—যাদের মাথায় শিখ-পাগড়ি, গায়ে সাহেবি কোট

ও পায়ে যোধপুরী পাজামা ও ডসনের বুট, তারা আজ কদিন ধরে আমার লম্বা চোগা ও গোর্খা টুপিটার উপরে বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করছে এবং দুইবেলা আমার গা-ঘেঁসেই বলাবলি করে চলেছে—"আজব টোপি ! আজব চোগা !" আজবের মধ্যে আমার দুটিমাত্র পদার্থ—দুইটিই তিব্বতীয় এবং শীতের সম্পূর্ণ উপযোগী। কিন্তু আজবের সংগ্রহ এগরীবের চেয়ে আমীর-পুত্র-কয়টির অনেক বেশী ছিল। সুতরাং যুদ্ধে আমারই হার লেখা গেল। এক মেমসাহেব শিলাতলে বসে মসুরী-ভ্রমণের নোট নিচ্চেন। তিনিও দেখলাম আমার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করেই চট্-কোরে খাতায় কি-এক লাইন টুকে নিলেন। তাঁর সে-নোট ইউরোপীয় যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত দুই-একজন নিকট-বন্ধুছাড়া আর কারু হাতে পড়ছেনা। যাই হোক, এইরকম সব ছোট-খাট উৎপাত এড়াতে মানুষের পথে আমি চোগা ছেড়ে প্রকটা প্রকাণ্ড সোলাটুপি ও তদুপযুক্ত চাঁদনীর কোট-প্যাণ্ট পরিধান করে বিচরণ কোরে বেড়াই। তাতে মানুষেরা আমায় আর তাড়া দিচ্ছেনা বটে কিন্তু মানুষের উল্টোপিঠের জীব যারা, তারা আমাকে তরুশাখার উপর থেকে একটা আয়না দেখিয়ে ইঙ্গিত করতে ছাড়েনা। সুতরাং বলার জ্বালায় আমার চলা দুর্ঘট হয়েছে—কি পথে, কি বিপথে। অথচ ডাক্তার পরামর্শ দিচ্ছেন চলবারই।

পথে যাই, কি বিপথে; চলি কি না চলি !—এই দো-টানার মধ্যে যখন আমি ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় কোনো-রকমে পথ-

বিপথ দুইয়েরই মান রেখে দিনযাপন করছি,—সেই-সময় দেখি পর্ব্বত একেবারে আপাদমস্তক ফুলের সাজ পোরে সহসা বসন্তের বাসর জমিয়ে বসেছেন। "ফুলন ফুলত ভার ভার!" যত পাতা, তত ফুল! যেখানে যত ধরা ছিল—পাথরের বুকে, শাখায়-শাখায় পাতায়-পাতায়—সূর্য্যের উদয়-অস্তের যত রং, আজ তারা ফুল হয়ে বাহিরে এসেছে! ঋতুরাজের বাঁশীর ডাকে পৃথিবীর সমস্ত সবুজ রংটা দেখছি বিপুল হিল্লোলে মেঘ অতিক্রম কোরে গিরিশিখর পর্য্যন্ত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে! মেঘের বুক থেকে ইন্দ্রধনুর ফোয়ারা সাতরঙের পিচকারি আকাশে ছিটিয়ে দিচ্ছে; আর সন্ধ্যার কুঙ্কুম, সকালের হলুদে হিমালয়ের সাদা আর গেরুয়া-বসনের দুই পিঠই দুইবেলা রঙের প্লাবনে ডুবিয়ে দিয়ে বইছে উত্তর-তীরের বসন্ত বাতাস।

বসন্তের সঙ্গে অকস্মাৎ পরিচয়ের আনন্দটা আমার পথ-বিপথ দুটোরই ভাবনা ঘুচিয়ে দিয়েছে। আমি আজকাল যখন যে সাজটা হাতের কাছে পাই সেই-বেশেই ঋতুরাজের দরবারে ত্রিসন্ধ্যা হাজির দিচ্ছি—একেবারে নির্ভয়ে।

ইনি এই পর্ব্বতের এক নামজাদা মহিলা আর্টিষ্ট! আজ কদিন ধরে আমার যাবার-আসবার পথ-আগ্‌লে হিমালয়ের একটা দৃশ্য-পট লিখতে বসেছেন। সমস্ত উত্তরদিক জুড়ে তুষারের উপরে সন্ধ্যা মুঠো-মুঠো ইন্দ্রধনুচূর্ণ ছড়িয়ে আলপনা টেনে যাচ্ছেন,—মনেই ধরা যায় না, সে এমন বিচিত্র;—একটুক্‌রো

সাদা কাগজে এরি নকল নিচ্ছেন অমোদের এই মহিলা আর্টিষ্ট !

উপহাসকে সেদিন আর পুরু পাহাড়ী-চোগার মধ্যে ঢেকে রাখা গেলনা। সে একটা অকাল-বাদলের আকার ধোরে বাতাসে কুয়াসায় ও জলের ঝাপ্‌টায় চিত্র-কারিণীর রং, তুলি, কাগজপত্র উড়িয়ে নিয়ে, অবশেষে তাঁর অতি-আবশ্যকীয় রং-মেশাবার জল-পাত্রটি পর্য্যন্ত উল্‌টে দিয়ে, দুরন্ত একটা পাহাড়ী-ছাগলের পিছনে-পিছনে পলায়ন করলে একেবারে গিরিশৃঙ্গে।

এই দলের এক আর্টিষ্টের কতকগুলো ছবি নিয়ে একটা লোক কোন্‌-একটা পাহাড়ে শিল্প-প্রদর্শনী খুলেছে! যিনি কবি, যিনি কর্ম্মী তিনি ঐ নীল আকাশ-পটে আলো-অন্ধকারের টান্‌ দিয়ে ছবি সৃষ্টি করছেন; আর আমরা যারা কবিও নই, শিল্পীও নই, ঐ আসল ছবিগুলো দেখে একটা-একটা জাল দলিল প্রস্তুত কোরে নিজেদের নামের মোহরটা খুব বড়-কোরেই তাতে লাগিয়ে দিচ্ছি —নির্লজ্জভাবে।

মানুষ সে মানুষই, বিধাতা তো নয় যে তার সৃষ্টিটা বিধাতারই সমান কোরে তুলতে হবে? মানুষের শিল্প মানুষকে আগাগোড়া স্বীকার কোরে বিশহাত দশমুণ্ড অথবা বিধাতার গড়া নরনারীমূর্ত্তির চেয়ে সুন্দর হয়ে যদি দেখা দেয় দিক্‌, তার মধ্যে প্রবঞ্চনার পাপ তো ফুটে ওঠে না! কিন্তু তুষারপর্ব্বত না হয়েও যেটা তুষারের

ভ্রম জন্মে দিয়ে চলে যেতে চায়, সেটাকে আমরা কি বলব? সে যে বিধাতা এবং মানুষ দুয়েরই সৃষ্টির বাহিরে থেকে দুজনকেই অপমান করতে থাকে!

আমার এ-বাগানে ফুল আর ধরছেনা। প্রতিবেশী সাহেব-সুবার ছেলেমেয়েরা—তাদের আঁচল নেই—খড়ের টুপি ভরে ফুল লুট করে নিয়ে চলেছে। আমাদের গয়লা-মালী, তার অনেক যত্নের এ-ফুল। ওই শিশু-পঙ্গপালের বিরুদ্ধে সে আমার কাছে নালিশ জানায় বটে কিন্তু ফুলের মকদ্দমা তার দিনের পর দিন মুলতুবিই থাকে।

সেদিন এই গয়লার একটা কালো বাছুর খাদ্যাখাদ্য বিচার না কোরেই নিতান্ত ছেলেমানুষি-বশত সাহেবদের বাগানের একটা ফুলগাছ সমূলে নিঃশেষ করে ধরা গেছে। সাহেবের চৌকিদার বাছুরকে থানায় দিতে চলেছে। পথে বেচারা অবোধ জীব মানুষের এই আইনের বিরুদ্ধে বিষম আপত্তি জানাচ্ছে এবং দেখছি তার বড় বড় দুটো চোখ চারিদিককে কেবলি প্রশ্ন করছে সকাতরে —কি তার অপরাধ জানতে। গোরু-বাছুরের উপরে চৌকিদারের একটা শ্রদ্ধা অনুমান কোরেই যেন সাহেব, পুলিশের উপর একখানি জবাবি চিঠি দিয়েছিলেন; সুতরাং উৎকোচ দিয়ে যে নিরপরাধ জন্তুটিকে খালাস করে দিই এমন উপায়ও ছিল না। তখন গয়লাকে তার বাছুরের হয়ে ত্রুটি স্বীকার কোরে মার্জ্জনা-ভিক্ষা কোরতে পাঠিয়ে দিয়ে ফুলের দুটা মোকদ্দমা একই দিনে নিষ্পত্তি

করলেম। এমনি করেই নির্ব্বিবাদে পর্ব্বতে-পর্ব্বতে ফুল-ফোটার দিন অবসান হল।

যেপর্ব্বতটাকে ঘিরে চঞ্চল হরিণ-শিশুর মতো আমার চলার পথটি নৃত্য কোরে খেলা কোরে চলেছে, তারি মেরুদণ্ডের ঠিক উপরে সজারুর কাঁটার মতো ঘন দুই সারি দেবদারু। শরতের বাতাস এখান থেকে শব্দের একটা জাল নীল-আকাশে দিবারাত্রি নিক্ষেপ করছে। একদিকে হিমালয়, আর-একদিকে "সহস্রধারা"র উপত্যকা—যেখানে সূর্য্য-উদয় এবং যেখানে সূর্য্যের অস্তগমন—এ দুই দিকই আমি দেখি এইখানটিতে বোসে।

ফুলের রাজত্ব শেষ হয়েছে। আকাশের চোখে রঙের নেশা আর তেমন কোরে লাগে না; সূর্য্যের আলোতে ঝরা-পাতার কস্ ধরেছে, তুষারের সাদা দিনে-দিনে নীল-আকাশে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে—চাঁদের আলোর সঙ্গে-সঙ্গে।

হিমালয়ের দিনগুলিতে বিজয়ার সুর লেগেছে। এই সুর লোহার কসের মতো পাথরের গায়ে, ঘাসের সবুজে, সন্ধ্যার সিঁদুরে মিশিয়ে গিয়ে দিনান্তেরও পরপারে রাত্রির অনেকদূর পর্য্যন্ত আকাশের গায়ে গেরুয়ার টান্-দিয়ে-দিয়ে বাজছে। দিন যেন আর যায় না! শরতের চাঁদনী-রাতের তীরেও নীলাকাশের বিরহী নীলকণ্ঠ আপনার একটিমাত্র সুরে বেদনার নিশ্বাস টান্‌ছে শুনি—উঃ উঃ!

আজ আমাদের সে-দেশে নবমীর নিশি প্রভাত হল। এখানে

শরতের সাদা মেঘের দুখানা ডানা নীল-আকাশে ছড়িয়ে আজকের দিনটি যেন কৈলাসের তুষারে-গড়া একটি শ্বেত-ময়ূরের মতো কার ফিরে-আসার পথ চেয়ে পর্ব্বতের চারিদিকে কেবলি উড়ে বেড়াচ্ছে। আজ সন্ধ্যায় দেখছি ঠিক সহস্রধারার উপত্যকার মুখে—পর্ব্বতের পশ্চিম-গায়ে তৃণে-গুল্মে, লতায়-পাতায়, পাথরের গায়ে, পথের ধূলায়, ফুলের মতো, আবীরের মতো, মাণিকের আভার মতো একটা আলো জ্বল্‌জ্বল্ করছে; মনে হচ্ছে যেন তুষারের হৃদয়-রক্ত গলে এসে হিমালয়ের এই পশ্চিম-দুয়ারের সোপানে আল্‌পনার মতো ছড়িয়ে পড়েছে। এরি উপর দিয়ে দেখছি, সন্ধ্যাতারার মতো একটি বন-বিহঙ্গী—আলোয়-গড়া মোনাল পাখী সে—চলে গেল পায়ে-পায়ে গিরিশিখর অতিক্রম কোরে—চাঁদনী-রাতের প্রাণের ভিতরে। আজ দেখলেম তুষারের শিখরে চাঁদ উঠছে আলোর একটা সুকোমলচ্ছটা আকাশে বিকীর্ণ কোরে। হিমালয়ের আর-সমস্তটা আজ অন্ধকারে ডুবে রয়েছে। ঘরে এসে দেখছি এ-পাহাড়ের এক ভিখারী আমার জন্যে তার শরৎকালের উপহারটি রেখে গেছে—একগোছা সোনালী কুশ আর কাশ! সুদূর পাহাড়ের কোন্ নিরালা পথের ধারে এরা নত হয়ে পড়েছিল, চলে যেতে কার সোনার আঁচল উড়ে-উড়ে এদের স্পর্শ কোরে কনক-চূর্ণের বিভূতি দিয়ে এদের সাজিয়ে গেছে!

ভেঙে-পড়া দেবদারুর নির্য্যাস-গন্ধ দিকে-দিকে ছড়িয়ে দিয়ে আজকাল বরফের হাওয়া বইতে আরম্ভ হয়েছে। পথ-দিয়ে

ক্রমাগত কম্বল-পরা পাহাড়ীর দল্ কাঠের বোঝা, ভালুকের আর বনবেড়ালের ছাল নিয়ে, গহন বন থেকে 'মোনালপাখির' সোনার পাখা মৌচাকের সোনালী মধু চুরি কোরে ঘরে-ঘরে ফেরি দিচ্ছে। কোনো দিকে কুয়াসার লেশমাত্র নেই; দিনরাত্রি সমান পরিস্কার। কেলুগাছের ফলন্ত শাখায় প্রশাখায় গিরি-মাটির একটা রং লেগেছে।

পার্ব্বতী রুক্ষ রক্ত-বাস আপনার সর্ব্বাঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে কঙ্কালিনী বেশে দেখা দিয়েছেন। অনেক দূরের একটা পাহাড়; তার গায়ে একটি-একটি গাছ দ্বিপ্রহরে চাকা-চাকা কালো দাগ ফেলেছে;—যেন প্রকাণ্ড একখানা বাঘছাল রৌদ্রে বিছানো; এরি উপরে চির-তুষারের ধবল মূর্ত্তি সারাদিন সুস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। একটির-পর-একটি গিরিচূড়া হিমে সাদা কোরে দিয়ে শীত আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে দেখতে পাচ্ছি। পর্ব্বতে-পর্ব্বতে মানুষের জ্বালানো দীপমালা থেকে দু-দশটা কোরে আলোর ফুল্‌কি প্রতিদিনই দেখছি খসে পড়ছে, আর নীল-আকাশে দীপালী উৎসব ক্রমেই দেখছি জমে উঠ্‌ছে। এখানকার হাট-ভাঙবার পালা সুরু হয়েছে, পূজোর ছুটির যাত্রীরা দলে-দলে ঘোড়াতে ডাণ্ডিতে ক্রমে পর্ব্বত খালি কোরে দিয়ে নেমে চলেছে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সমস্তটা দৈন্য এবং অশোভনতা—দেশী-বিদেশী নির্ব্বিশেষে—তার মুরগীর ঝুড়ি, আধপোড়া হাঁড়ি, ছিট্‌মোড়া ময়লা বিছানা, দড়ি-বাঁধা বাক্স, কড়ি-বাঁধা হুঁকা, হলুদের ছোপধরা চিনের

বাসন নিয়ে ঘর ছেড়ে আজ রাস্তায় বেরিয়েছে এবং ময়লা জলের একটা নালার মতো পাহাড়ের গা-বেয়ে নেমে চলেছে।

এই যে-ক'টা ঋতুর মধ্যে দিয়ে শীতের আগে পর্য্যন্ত এই পাহাড়ে লক্ষ লক্ষ পাখী এল—বাসা বাঁধলে, সংসার পাতলে, বাস করলে—আবার চলে গেল দূরদূরান্তরে, আকাশ-পথে দলে দলে, কি সুন্দর, কি স্বাধীন এদের গতিবিধি! আর মানুষ যে জলে-স্থলে-আকাশে আপনার রাজত্ব বিস্তার কল্লে তার যাওয়ায় কি অশোভনতা! সিন্ধবাদের বিকটাকার বুড়োটার মতো সে আপনার সঞ্চিত কাজের বাজের মূল্যবান অথচ মূল্যহীন আসবাবের আবর্জ্জনাকে বয়ে চলেছে দেখছি—বোঝার ভারে নুয়ে পোড়ে হাঁপ্যতে-হাঁপাতে। পাখী চলে গেল, সে তার বাসার একটি কুটোও নিয়ে গেল না; আর মানুষ যেতে চাচ্ছে আস্তাবলের খড়-কুটোটা এবং আস্তাকুঁড়ের ভাঙ্গা ঝুড়িটা, এমন-কি রাস্তার কাঁকর-গুলো পর্য্যন্ত সংগ্রহ কোরে মোট বেঁধে নিয়ে।

প্রথমে এসে পর্ব্বতে-পর্ব্বতে পথ-হারিয়ে আমি প্রায়ই অন্যের বাগানে অনধিকার প্রবেশ কোরে লজ্জিত হয়েছি, এখন সে-ভয় গিয়েছে। প্রায় অধিকাংশ বাড়ীরই ফাটক বন্ধ এবং পর্ব্বতের গভীর থেকে গভীরতম প্রদেশের পথ একেবারে খোলা হয়ে গেছে। আমি সেখানে অবাধে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করছি। চন্দ্র-সূর্য্যের উদয়াস্তের মধ্যে দিয়ে ছবির পর ছবি, কিন্নরীর ঝাঁকের মতো চিত্র-বিচিত্র আলোর পাখনা মেলে, এ কয় দিন আমার

অন্তরের বাহিরে সকালে-সন্ধ্যায় দিনে-রাতে উড়ে-উড়ে বেড়াচ্ছে। এদের ধরতে গিয়ে দেখি, এদের সমস্ত শ্রী লজ্জাবতী লতার মতো আমার আঙুলের পরশে ম্লান হয়ে গেল। শীত এসেছে। হিমের অভিযানের পূর্ব্ব থেকেই গাছগুলো তাদের পাতার অনাবশ্যক বাহুল্য ঝেড়ে-ঝুড়ে আপনাদের সমস্ত শক্তি ভিতরে-ভিতরে সঞ্চয় কোরে বেশ শক্ত হয়ে উঠেছে। বসন্তে ফুলের ভারে এরা নুয়ে পড়েছিল দেখেছি, আর আজ দুদিন পরে বরফের পীড়ন সুদীর্ঘ শীতের দিন-রাত্রিতে বহন করবে এরাই অনায়াসে—ফুলেরই মতো, পাতারই মত! পর্ব্বতের সক্ষম সহিষ্ণু সন্তান এরা, পাথরের বুকের ভিতরকার স্নেহ এদের বড় কোরে তুলেছে,—অটুট এদের প্রাণ!

আর মানুষ যাদের যত্নে বাড়িয়েছে সেইসব ক্ষীণপ্রাণ গাছদের মালীরা দেখছি আজকাল তুষারের কবল থেকে রক্ষা করবার জন্য কাচ-মোড়া গরম ঘরে নিয়ে তুলছে—শুকনো ঘাসের রক্ষাকবচ তাদের সর্ব্বাঙ্গে ঝুলিয়ে দিয়ে।

এখানকার পাহাড়ীগুলো মোটেই পাহাড়ী নয়, তারা আসলে চাষী;—যখন ক্ষেতের কাজ নেই, ডাণ্ডিতে এসে কাঁধ দেয়। পাহাড়ের পথগুলো চেনে কিন্তু পাহাড়কে চেনে না, বরফকে এরা ভয় করে। পর্ব্বত যেখানে ক্ষেতের উপরে নদীর জলে আপনার ছায়া ফেলেছে সেখান থেকে উঠে এসেছে এরা; আবার সেই-খানেই ফিরে যেতে চায়। আজ কদিন ক্রমাগত এরা আমাকে

ভয় দেখাচ্ছে বরফ পড়ল-বোলে! কাল আমাদের যেতে হবে; কালো মেঘের ভ্রূ-কুটি বিস্তার কোরে একটা ঝড় দূর-পাহাড়গুলোর উপর দিয়ে আজ আমাদের দিকে চেয়ে দেখ্ছে। দিনের আলো নিষ্প্রভ, ধূসর আকাশ দুর্ব্বহ হিমের ভারে যেন নুয়ে পড়েছে। আমি পর্ব্বতের চূড়ায় একটা বন্ধ-বাড়ির বাগানে একলা উঠে এসেছি;—ঠাণ্ডা দিনটির ভিতর দিয়ে একটানা বরফের হাওয়া মুখে এসে লাগ্ছে। একেবারে ছায়ার মতো ঝাপ্সা কালো-কালো পাহাড়গুলোর উপরেই আজ তুষারের সাদা ঢেউ যেন এগিয়ে এসে লেগেছে—চোখের সাম্নেই দাঁড়িয়েছে যেন! এ বাগানটা যাদের, তারা চলে গেছে; টিনের ঘরে তালা দিয়ে বাগানের যত ফুলগাছ সব রেখে গেছে। এদের বুড়ো মালী একটা কেলুগাছের তলায় কতকগুলো চারাগাছের উপরে খড়ের ঝাঁপ আড়াল দিচ্ছিল। সে আমাকে তার কাজ ফেলে বাগান দেখাতে লাগলো। কাচের ঘরে সাহেবের যত মূল্যবান সৌখিন ফুলের গাছ—জাল-দিয়ে-ঘেরা; টেনিস্ খেলার একটা চাতাল, এর উপরে একহাত বরফ সেবারে পড়েছিল; এইটে মেম-সাহেবের চা-পানের মণ্ডপ; এই রাস্তা দিয়ে সাহেবের ঘোড়া পর্ব্বতের উপর আস্তে পারে, ওখানে সাহেবের কাছারির তাম্বু পড়ে, বাড়ির এই-দিকটা পুরানো আর ঐ-দিকটে সাহেব অনেক ব্যয়ে নূতন করে বানিয়েছে ইত্যাদি! অনেক দেখিয়ে মালী আমাকে একটা জায়গায় নিয়ে এসে বল্লে,

ঐযে ভাঙা বাংলাটা ঐটেই যে এ-বাগান প্রথম বানিয়েছিল তার; ওদিকে আরো অনেকটা বাগান ছিল, বরফে ধ্বসিয়ে দিয়েছে; আমি ছোটবেলায় সেই বাগান দেখেছি। মালী যেদিক দেখালে সেদিকে তুষার-পর্ব্বত পর্য্যন্ত নির্ম্মল একটি শূন্যতা ছাড়া আর কিছুই নেই। এরি ধারটিতে সেই ভাঙা বাংলা; ভাঙনের গা-বেয়ে একটি গোলাপ-লতা ভাঙা ঘরখানার চালের উপর দিয়ে একেবারে তুষার-পর্ব্বতের দিকে চলে পড়েছে—ফুলের একটা উৎস! এর কাঁটায়-কাঁটায় ফুল, গাঁটে-গাঁটে ফুল,—পর্ব্বতের শিখরে এ যেন একটা ফুলের স্বপ্ন! বসন্তের বুল্‌বুল্ নয়, তুষারের সাদা পাখী একে ডেকেছে—শূন্যতার ঐ ওপার থেকে!

অবরোহণ

চলা-বলা সব বন্ধ কোরে যা-কিছু কুড়োবার কুড়িয়ে, যা-কিছু গুড়োবার গুড়িয়ে বসেছি। পাহাড়ের নীচে থেকে কুলীর সর্দ্দার চীৎকার কোরে ডাক্‌ছে—'ফাল্‌তো, ফাল্‌তো! হারেরে বেগার কুলী!'

আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালা

বঙ্গদেশে যাহা কেহ ভাবেন নাই, শুনেন নাই, আশাও করেন নাই। বিলাতকেও হার মানিতে হইয়াছে— সমগ্র ভারতবর্ষে ইহা নূতন সৃষ্টি! বঙ্গসাহিত্যের অধিক প্রচারের আশায় ও যাহাতে সকল শ্রেণীর ব্যক্তিই উৎকৃষ্ট পুস্তক পাঠে সমর্থ হন, সেই মহা উদ্দেশ্যে আমরা এই অভিনব 'আট আনা সংস্করণ' প্রকাশ করিয়াছি। মূল্যবান্ সংস্করণের মতই কাগজ, ছাপা, বাঁধাই প্রভৃতি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর। আধুনিক শ্রেষ্ঠ লেখকের পুস্তকই প্রকাশিত হয়।—

মফঃস্বল-বাসীদের সুবিধার্থ, নাম রেজেষ্ট্রি করা হয়; যখন যেখানি প্রকাশিত হইবে ভিঃ পিঃ ডাকে ॥৵০ মূল্যে প্রেরিত হইবে; প্রকাশিত গুলি একত্রে লইতে হয়। এই গ্রন্থমালায় প্রকাশিত হইয়াছে—

অভাগী (৪র্থ সংস্করণ)—শ্রীজলধর সেন।

ধর্ম্মপাল (২য় সংস্করণ)—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

পল্লীসমাজ (৪র্থ সংস্করণ)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

কাঞ্চনমালা (২য় সংস্করণ)—শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

বিবাহবিপ্লব (২য় সংস্করণ)—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম্-এ, বি-এল্।

দূর্ব্বাদল (২য় সংস্করণ)—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত।

বড় বাড়ী (২য় সংস্করণ)—শ্রীজলধর সেন।

অরক্ষণীয়া (২য় সংস্করণ)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

ময়ূখ—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ।

সত্য ও মিথ্যা—শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

রূপের বালাই—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

সোণার পদ্ম—শ্রীসরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ।

নাইকা—শ্রীমতী হেমনলিনী দেবী।

আলেয়া—শ্রীমতী নিরুপমা দেবী।

বেগম সমরু (সচিত্র)—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।